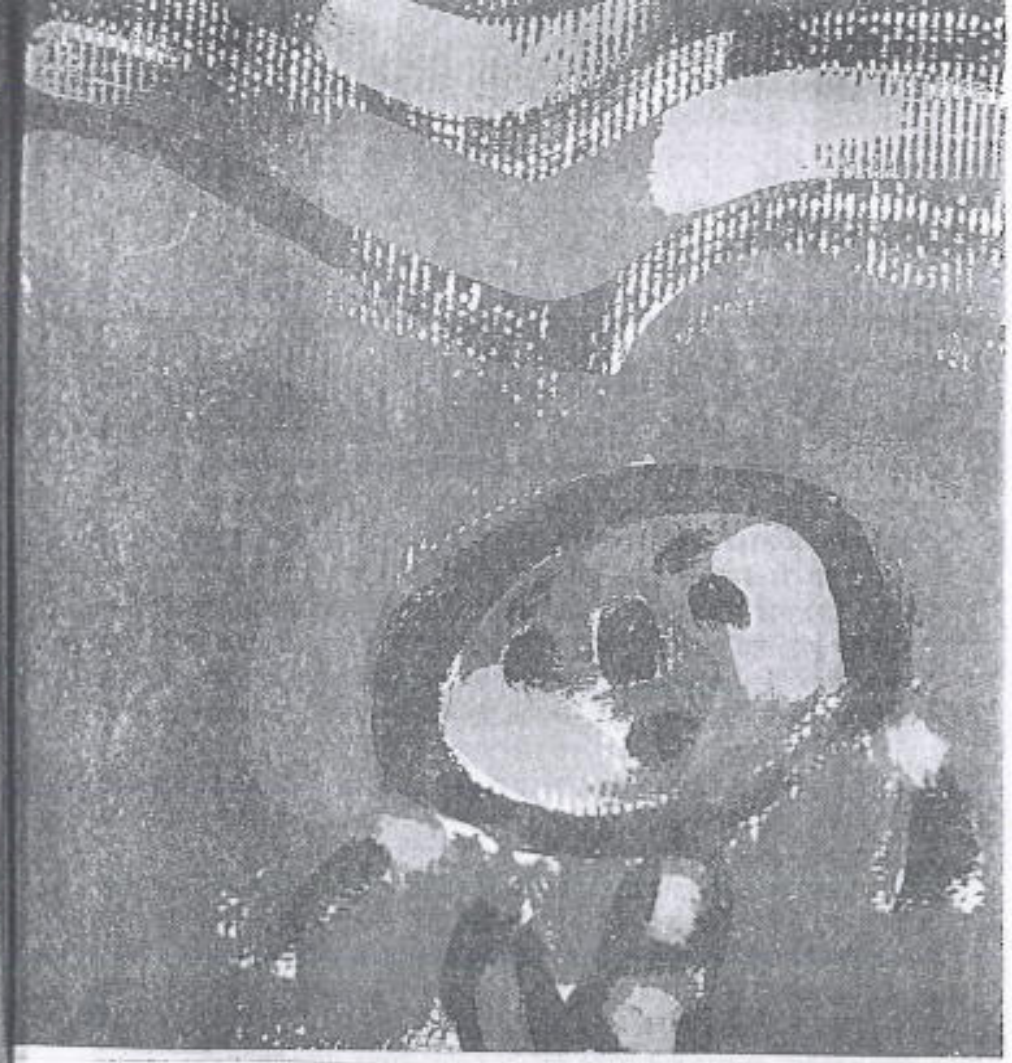

বকুলাপ্পু

১

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে।

চন্দ্রা নদী তীর ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে এসে পলাশপুর গ্রামের বড় হিজল গাছটা পর্যন্ত এসে হঠাৎ করে থেমে গেল। হিজল গাছটার অর্ধেক তখন শূন্যে নদীর কালো পানির উপর ঝুলছে, বাকি অর্ধেক কোনভাবে মাটি কামড়ে আটকে আছে— দেখে মনে হয় যে-কোনমুহূর্তে পুরো গাছটা বুঝি পানিতে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। এই গাছটা ছিল পলাশপুর গ্রামের বাচ্চাকাচ্চাদের সবচেয়ে প্রিয় গাছ। তারা এর মোটা ডাল বেয়ে উপরে উঠত, মাঝারি ডালগুলোতে ঘোড়ার মতো চেপে বসে দুলত, সরু ডালগুলো ধরে ঝুল খেয়ে নিচে লাফিয়ে নামত। নদীর ভাঙনের মাঝে পড়ে যাওয়ায় প্রথম প্রথম বাচ্চারা কেউ এই গাছে উঠতে সাহস করত না। এক-দুই দিন যাবার পর গ্রামের দুর্দান্ত আর ডানপিটে কয়েকজন একটু একটু করে গাছটায় আবার ওঠা শুরু করল, কিন্তু ঠিক তখন জমিলা বুড়ি একদিন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে হিজল গাছটা নিয়ে তার বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীটা ঘোষণা করল। তারপর আর কাউকে হিজল গাছের ধারেকাছে দেখা যায়নি।

এই এলাকার সবাই জানে জমিলা বুড়ির বয়স কম করে হলেও একশো পঞ্চাশ, তার কমপক্ষে এক ডজন পোষা জ্বীন আর পরী রয়েছে এবং জোৎস্নারাতে সে 'গাছ-চালান' দিয়ে শ্যাওড়া গাছে বসে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তার মাথার চুল পাটের মতো সাদা, এই গ্রামের যারা থুরথুরে বুড়ো তারাও দাবি করে যে জন্মের পর থেকেই তারা জমিলা বুড়ির পাকা চুল দেখে আসছে। মানুষের বয়স বেশি হয়ে গেলে মাথার চুল পাতলা হয়ে যায়, কিন্তু জমিলা বুড়ির মাথাভরা সাদা চুল এবং সে দুই হাতে সবসময় তার মাথার চুল বিলি কাটতে থাকে। বয়স বেশি হওয়ার কারণে সে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, হাতে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে কেমন জানি ভাঁজ হয়ে দাঁড়ায়। জমিলা বুড়ির লাঠি নিয়েও নানারকম গল্প রয়েছে— অনেকেই মনে করে এটা আসলে একটা শঙ্খচূড় সাপ, জমিলা বুড়ি জাদু করে লাঠি তৈরি করে রেখেছে। কবে নাকি এক চোর জমিলা বুড়ির কুঁড়েঘরে চুরি করতে গিয়েছিল, তখন বুড়ি তার লাঠি ছুড়ে দিতেই সেটা ফণা তুলে চোরকে ধাওয়া করেছিল, কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে সেই চোর। জমিলা বুড়ির পিঠে থাকে তালি-দেওয়া একটা ঝোলা। সেই ঝোলার ভিতরে কী থাকে সেটা নিয়েও নানারকম গবেষণা হয় যদিও সবাই একমত হতে পারে না। কেউ বলে ছোট ছোট বাচ্চাদের জাদু করে ইঁদুর নাহয় ব্যাঙে পালটে ফেলে সে ঝোলার মাঝে রেখে দেয়, কেউ বলে, তার ঝোলার মাঝে আটকা পড়ে আছে বেয়াদব ধরনের কিছু জ্বীন। জমিলা বুড়ি সবসময়

বকবক করে কথা বলছে, দেখে মনে হতে পারে সে বুঝি নিজের সাথে কথা বলে, কিন্তু অভিজ্ঞ মানুষেরা দেখেই বুঝতে পারে যে সে তার পোষা জ্বীনদের সাথে কথা বলছে। কী বলছে সেটা অবিশ্যি বোঝা খুব কঠিন, দাঁতহীন তোবড়ানো মুখের কথা শোনা গেলেও ঠিক বোঝা যায় না।

ছোট ছোট বাচ্চারা জমিলা বুড়ি থেকে দূরে দূরে থাকে, কোন্ সময় তাদের ধরে তার ঝোলার মাঝে ঢুকিয়ে নেবে সেই ভয়ে তারা ধারেকাছে আসে না। যারা একটু বড় এবং একটু বেশি সাহসী তারা মাঝে মাঝে জমিলা বুড়িকে দেখলে দূর থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, 'জমিলা বুড়ি জমিলা বুড়ি—পাশ না ফেল?'

জমিলা বুড়ি সাধারণত এইরকম প্রশ্নের উত্তর দেয় না, আপন মনে বিড়বিড় করে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ কখনো কখনো ফোকলা-মুখে ফিক করে হেসে বলে, 'পাশ।' যাকে বলে তখন তার আনন্দ দেখে কে, জমিলা বুড়ি বলেছে 'পাশ' অথচ সে পরীক্ষায় পাশ করেনি এরকম ঘটনা পলাশপুর গ্রামে এখনও ঘটেনি।

সবাইকেই যে জমিলা বুড়ি 'পাশ' বলে তা নয়। মাঝে মাঝে তার মেজাজ গরম থাকে, তখন সে তার লাঠি নিয়ে তাড়া করে বলে, 'ফেল ফেল তোর চৌদ্দগুষ্টি ফেল।' যাদেরকে এরকম অভিশাপ দেওয়া হয় তারা সাধারণত পড়াশোনা করা ছেড়ে দেয়। দেখা গেছে তারা শুধু যে পরীক্ষায় ফেল করে তাই নয় তাদের বাবারা মামলায় হেরে যায়, চাচাদের বাড়িতে চুরি হয়, মামাদের গরু মরে যায়, বোনদের বিয়ে হয় না (যদিবা বিয়ে হয় যৌতুক নিয়ে জামাইয়েরা বউদের মারধর করে)— এক কথায় তাদের জীবনে এই ধরণের হাজারো রকম ঝামেলা শুরু হয়ে যায়।

এই জমিলা বুড়ি একদিন নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে হিজল গাছটাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। যারা আশেপাশে ছিল তারা দেখল জমিলা বুড়ি গাছটাকে কিছু-একটা জিজ্ঞেস করল এবং গাছ যে উত্তরটা দিল সেটা তার পছন্দ হল না বলে লাঠি নিয়ে ঠুকঠুক করে হেঁটে হেঁটে কাছে গিয়ে গাছকে কষে লাথি দিয়ে গালিগালাজ করতে শুরু করল। গাছের সাথে জমিলা বুড়ির কী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে সেটা সাধারণ মানুষদের পক্ষে বোঝা কঠিন, কিন্তু তাদের দুজনের মাঝে যে খুব রাগারাগি হচ্ছে সেটা নিয়ে কারও কোনো সন্দেহ রইল না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জমিলা বুড়ি তার লাঠি তুলে গাছকে অভিশাপ দিল, আগামী 'চান্দের' আগে এই গাছ নদীতে ভেসে যাবে। শুধু তাই না, এই গাছ যখন পানিতে হুড়মুড় করে পড়বে তখন একজন মানুষের জান 'কবজা' করে নিয়ে যাবে।

যে-গাছ নতুন চাঁদ ওঠার আগে একজন মানুষের জান নিয়ে নদীর পানিতে ধসে পড়বে সেই গাছের ধারেকাছে যে কেউ যাবে না তাতে অবাক হবার কী আছে? কাজেই পলাশপুর গ্রামের বিশাল হিজল গাছটা অর্ধেক ডাঙায় আর অর্ধেক নদীর পানির উপর বিস্তৃত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একসময় যার ডালে ডালে ছোট ছোট বাচ্চারা লাফঝাঁপ দিত এখন সেটি জনশূন্য নির্জন, সেখানে কেমন যেন চাপা ভয়-ধরানো থমথমেভাব। গাছে ওঠা দূরে থাকুক তার নিচেও কেউ যায় না।

একেবারে কেউই কখনো হিজল গাছটার নিচে যায়নি সেটা অবিশ্যি পুরোপুরি সত্যি নয়, কাজীবাড়ির ছোট মেয়ে বকুলকে এক দুই বার সেই গাছের নিচে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেছে।

বকুল কাজীবাড়ির মেজো ছেলের ছোট মেয়ে। তার বয়স বারো। তার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং তারা সুখে সংসার করছে। তার বড় দুলাভাইয়ের সদরে মনোহারী দোকান রয়েছে, মেজো দুলাভাই ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার। বকুলের ছোট ভাই শরিফ নেহায়েৎ শান্তশিষ্ট ছেলে, বড় হয়েও যে সে শান্তশিষ্ট থাকবে এবং একটা স্কুলের (কিংবা কে জানে হয়তো কলেজের) মাস্টার হয়ে যাবে সেটা নিয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। তবে বকুলকে নিয়ে কী হবে সে-ব্যাপারে শুধু কাজীবাড়ির নয় পুরো পলাশপুর গ্রামের সব মানুষের মনে সন্দেহ রয়েছে। তার বয়স বারো, আর কয়েক বছরের মাঝেই এই গ্রামের নিয়মে তার বিয়ের বয়স হয়ে যাবে কিন্তু বকুলের কথাবার্তা আচার-আচরণে তার কোন ছাপ নেই। তার সমবয়সী কোন মেয়ের সাথে তার ভাব নেই, সে ঘোরাফেরা করে ছেলেদের সাথে। তার মতো ফুটবল কেউ খেলতে পারে না, মারবেল খেলে সে এলাকার সবাইকে ফতুর করে দিয়েছে। চোখের পলকে সে যে-কোনো গাছের মগডালে উঠে পড়তে পারে, বর্ষাকালে বানের পানিতে যখন চন্দ্রা নদী ফুলেফেঁপে ওঠে তখন সে আড়াআড়িভাবে সাঁতরে নদী পার হয়ে যায়। পলাশপুর গ্রামে কোন হাইস্কুল নেই বলে বড় বড় সব মেয়ের পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বকুল একরকম জোর করে পাঁচ মাইল দূরে হাইস্কুলে পড়তে যায়। ভোরবেলা সে পলাশপুর গ্রামের বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে গ্রামের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যায়, স্কুলে যাবার এবং সেখান থেকে ফেরার সময় সড়কের দুই পাশের গাছগাছালি, পুকুর, খাল, বিল সবকিছু চষে বেড়ায়।

বকুলের সমবয়সী মেয়েরা, যারা কয়েক বছরের মাঝে বিয়ে করে ঘর-সংসার করার জন্যে রান্নাবান্না আর ঘর-সংসারের কাজকর্ম শিখছে, তারা বকুলের কাজকর্মের কথা শুনে একেবারে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেও ভিতরে ভিতরে সবসময় কেমন যেন হিংসা অনুভব করেছে।

বকুলকে যারা পছন্দ করে তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। তাদের বেশির ভাগের বয়স পাঁচ থেকে দশের মাঝে। তারা একেবারে বাধ্য সৈনিকের মতো বকুলের পিছনে পিছনে ঘোরে, বকুল তার এই অনুগত ভক্ত ছেলেমেয়েদেরকে কেমন করে গাছে চড়তে হয় শেখায়, নদী সাঁতরে পার হওয়া শেখায়, পাখির বাচ্চা ধরে এনে দেয়, গুলতি তৈরি করে দেয়, ফুটবল খেলায় কেমন করে ল্যাং মারতে হয় আবার অন্য কেউ ল্যাং মারার চেষ্টা করলে কীভাবে লাফিয়ে পাশ কাটাতে হয় তার কায়দা-কানুন হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেয়।

এই বকুল ভরদুপুরবেলা তাদের বাড়ির পিছনের পেয়ারা গাছের মগডাল থেকে একটা ডাঁশা পেয়ারা ছিঁড়ে নিচে নেমে আসছিল। তার ছিপছিপে শরীরে প্রায় কাঠবেড়ালির মতো গাছ বেয়ে ওঠা এবং নামা হিংসার চোখে দেখতে দেখতে পাশের বাড়ির সিরাজ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মেয়েছেলেদের গাছে ওঠা ঠিক না।"

বকুল নেমে গাছের মাঝামাঝি মসৃণ একটা ডালে পা ঝুলিয়ে বসে পেয়ারায় একটা বড় কামড় দিয়ে বলল, "মেয়ে আবার ছেলে হয় কেমন করে? আর কী হয় মেয়েরা গাছে উঠলে?"

সিরাজ গম্ভীর হয়ে বলল, "দোষ হয়। মেয়েছেলেদের কাজ হচ্ছে ঘর-সংসারের কাজ।"

বকুল গাছের ডালে বসে থেকে পিচিক করে নিচে থুতু ফেলে বলল, "তোকে বলেছে! মেয়েরা আজকাল পকেটমার থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সবকিছু হয় তুই জানিস?"

মেয়েরা প্রধানমন্ত্রী হয় শুনে সিরাজ বেশি অবাক হল না, কিন্তু পকেটমার হয় শুনে সে চোখ বড় বড় করে বলল, "সত্যি? মেয়েরা পকেটমারও হয়?"

বকুল তার মাথার এলোমেলো চুল ঝাঁকিয়ে বলল, "খালি পকেটমার? আজকাল মেয়ে-ডাকাত পর্যন্ত হয়! জরিনা ডাকাতের নাম শুনিসনি?"

সিরাজ নামটা শোনেনি, কিন্তু ছেলে হয়ে মেয়েদের এত বড় বীরত্বের কাহিনীটা সে এত সহজে মেনে নেবার পাত্র নয়, মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু সাহসের কাজ বেশি করে ছেলেরা!"

বকুল তার গাছের উপর থেকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "কচু! ছেলেরা যখন একটা সাহসের কাজ করে মেয়েরা তখন করে একশোটা!"

"কে বলছে?"

"বলবে আবার কে? সবাই জানে। পৃথিবীর যত মানুষ আছে সবার জন্ম হয়েছে মায়ের পেট থেকে। বাচ্চা জন্ম দেওয়া কত বড় সাহসের কাজ তুই জানিস? আছে কোন ব্যাটাছেলে যে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে? আছে?"

সিরাজ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কী? জানা কথা মেয়েদের সাহস বেশি, ছেলেদের কম। জমিলা বুড়ি হচ্ছে মেয়ে আর তাকে দেখে সব ছেলে কাপড়চোপড়ে— হি হি হি ....." বকুল কথা শেষ না করে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল।

বকুল যে-ঘটনাটা মনে করে হাসতে শুরু করেছে সেই ঘটনার নায়ক সিরাজ নিজে। সে যখন ছোট হঠাৎ একদিন জমিলা বুড়িকে দেখে ভয় পেয়ে পরনের কাপড়ে ছোট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছিল, এতদিন পরেও কারণে-অকারণে সেটা মনে করিয়ে তাকে নানাভাবে অপদস্থ করা হয়। কাজেই সিরাজ বকুলের কথাটা খুব সহজভাবে নিল না। চোখমুখ লাল করে বলল, "তার মানে তুই বলতে চাস তুই জমিলা বুড়িকে ভয় পাস না?"

বকুল পেয়ারার শেষ অংশ মুখে পুরে কচকচ করে চিবুতে চিবুতে বলল, "একটা বুড়িকে আবার ভয় পাবার কী আছে?"

"তার মানে — তার মানে—" সিরাজ রাগের চোটে তার কথা শেষ করতে পারে না। বকুল গাছের সরু ডালে একটা দোল খেয়ে নিচে নামতে নামতে বলল, "তার মানে কী?"

"তার মানে তুই জমিলা বুড়ির কথা বিশ্বাস করিস না?"

"পাগল মানুষের কথা বিশ্বাস করলেই কি আর না-করলেই কী?"

"তুই বলতে চাস, তুই—তুই—"

"আমি কী?"

"তুই হিজল গাছে উঠতে পারবি?"

বকুল একটু চমকে উঠল। যখন জমিলা বুড়ি আশেপাশে নেই তখন তাকে অবিশ্বাস করা, তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা এক কথা, আর যে-গাছটি একজন মানুষের জান কবজা করে পানিতে ভেসে যাবে সেই গাছে ওঠা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। বকুল থতমত খেয়ে চুপ করে রইল, তাই সিরাজের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে, সে চোখ ছোট ছোট করে বলল, "পারবি না, না?"

বকুল একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বলল, "কে বলেছে পারব না?"

সিরাজের চোখ গোল হয়ে যায়, "পারবি? হিজল গাছে উঠতে পারবি?"

"একশো বার।"

সিরাজ খানিকক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বকুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মিছিমিছি বলছিস, তাই না?"

"মিছিমিছি বলব কেন? চল আমার সাথে তোকে দেখাই!"

সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল, বলল "থাক, দরকার নেই।"

বকুলের মুখ আরও শক্ত হয়ে যায়, "কেন দরকার নেই? ভাবছিস আমি ভয় পাব? কখনো না! আয় আমার সাথে।"

এবারে সিরাজ আরও ঘাবড়ে গেল, বলল, "ঠিক আছে যা, আমি বিশ্বাস করেছি তুই পারবি।"

"কেন তুই মিছিমিছি বিশ্বাস করবি? আয় আমি সত্যি সত্যি উঠে দেখাই।"

কাজেই ভরদুপুরবেলা বকুলের পিছুপিছু সিরাজ নদীর দিকে রওনা দিল। বাড়ির বাইরে আসতেই আরও কিছু বাচ্চাকাচ্চা পাওয়া গেল। কী করা হবে শুনতে পেয়ে তাদের আত্মা শুকিয়ে গেল, তারাও নানাভাবে বকুলকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু কিছু-একটা বকুলের মাথায় ঢুকে গেলে সেটাকে বের করে আনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যখন বোঝা গেল সত্যি সত্যি বকুল হিজল গাছে উঠবেই তখন তারাও সাথে রওনা দিল—অন্তত ব্যাপারটা চোখে দেখা যাক। একজন মানুষ জীবনে আর কয়টা সাহসের কাজ দেখার সুযোগ পায়?

নদীর ঘাটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের দল ভারী হয়ে আসে, দূর থেকে দেখে সেটাকে একটা ছোটখাটো মিছিলের মতো মনে হতে থাকে। সবার সামনে বকুল তার পিছুপিছু সিরাজ এবং তার পিছনে নানা বয়সের বাচ্চাকাচ্চা। খবর পেয়ে বকুলের ছোট ভাই শরিফও চলে এসেছে, সে অনেকক্ষণ থেকে বকুলকে বুঝিয়েও কোনো সুবিধে করতে না পেরে কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "আমি কিন্তু বাবাকে বলে দেব।"

বকুল উদাস গলায় বলল, "যা, বলে দে। তারপর দেখ তোকে আমি কী ধোলাই দিই।"

শরিফের বয়স আট, তার এই আট বছরের জীবনে সে তার বাবার ওপরে যেটুকু নির্ভর করে তার থেকে অনেক বেশি নির্ভর করে বকুলের উপর। কাজেই সে যে বকুলের ধোলাই খেতে চাইবে না সেটা বকুল খুব ভালো করে জানে।

শেষ পর্যন্ত দলটি হিজল গাছের কাছে হাজির হল। সবাই দূরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ে এবং উত্তেজনায় তারা নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেছে। বকুল ওড়নাটা ভালো করে পেঁচিয়ে নিয়ে কোমরে শক্ত করে বেঁধে প্রায় ছুটে এসে একটা ডাল ধরে নিজেকে ঝুলিয়ে একটা হ্যাঁচকা টানে উপরে উঠে গেল। দূরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা সবাই একসাথে বুক থেকে একটা নিশ্বাস বের করে দেয়। বকুল তরতর করে আরও খানিকটা উপরে উঠে হাত তুলে বলল, "কী দেখলি?"

সিরাজ ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "দেখেছি। নেমে আয় এখন।"

বকুল কাঠবেড়ালীর মতো আরও খানিক দূর উঠে গিয়ে নদীর দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে দূরে রাজহাঁসের মতো সাদা লঞ্চটা দেখতে পেল।

মাঝেমাঝেই নদীতে এই লঞ্চটা আসে, অন্য লঞ্চে যেরকম মানুষ গাদাগাদি করে থাকে, ভটভট শব্দ করে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যায়, এটা মোটেও সেরকম না। এটা একেবারে ধবধবে সাদা, প্রায় নিঃশব্দে পানি কেটে এগিয়ে যায়। লঞ্চটা দেখতেও অন্যরকম, একটা ছোট বাসার মতো। নিচে থাকার ঘর, উপরে পাটাতন, সেখানে আবার

ঝালর-দেওয়া ছাদ। ঝালর-দেওয়া ছাদের নিচে এক-দুজন মানুষ থাকে, তাদের দেখেই বোঝা যায় তারা খুব সুখী। তাদের জামাকাপড়গুলো হয় সুন্দর, তাদের চোখে থাকে রঙিন চশমা, তারা নিজেদের মাঝে কথা বলে, হাসে। তারা হেসে হেসে কিছু-একটা খেতে খেতে নদীর তীরে তাকিয়ে থাকে। মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় তারা বুঝি স্বপ্নজগতের মানুষ। এই লঞ্চটা এলেই বকুল সবসময় লঞ্চটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কারণ সে জানে এই লঞ্চে ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে থাকে। সে-মেয়েটা একেবারে পরীর মতো সুন্দর, গায়ের চামড়া যেন গোলাপ ফুলের মতো নরম, চুলগুলো একেবারে রেশমের মতো। হালকা রঙের একটা ফ্রক পরে মেয়েটা শান্তচোখে তাকিয়ে থাকে। যে মানুষের চেহারা এত সুন্দর, যে এরকম রাজহাঁসের মতো লঞ্চে করে স্বপ্নের জগতের মানুষদের সাথে নিঃশব্দে পানি কেটে কেটে যায় তার মনে নাজানি কী বিচিত্র ধরনের সুখ। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বকুল কেমন জানি একধরনের হিংসা অনুভব করে। আহা, সেও যদি এরকম সুন্দর কাপড় পরে এরকম সেজেগুজে এই রাজহাঁসের মতো লঞ্চে করে যেতে পারত!

লঞ্চটা আরও এগিয়ে আসতে থাকে, বকুল ভালো করে দেখার জন্যে ডাল বেয়ে বেয়ে নদীর পানির দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে দুটি সরু সরু ডাল বের হয়ে এসেছে, ডাল দুটিতে পা রেখে সাবধানে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বকুল দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পায় চাপা একটা শব্দ করতে করতে লঞ্চ এগিয়ে আসছে, উপরে একটা চেয়ারে বয়স্ক একজন মানুষ বসে আছে, তার পাশে আরেকটা চেয়ার রেলিঙে হাতের উপর মুখ রেখে সেই মেয়েটি বসে আছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে বকুল প্রায় একটা চাপা শব্দ করে ফেলল, ইশ কী সুন্দর মেয়েটি! আর হঠাৎ কী আশ্চর্য, মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে সোজাসুজি বকুলের দিকে তাকাল। বকুলকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠল মেয়েটি, বকুল দেখতে পেল সোজা হয়ে বসেছে হঠাৎ, মুখটিতে কেমন যেন একটা বিস্ময়ের ছাপ পড়েছে, অবাক হয়ে দেখছে সে বকুলকে। লঞ্চটা প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে, একজনের কাছে আরেকজন আরও স্পষ্ট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। বকুল দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার চুল বাতাসে উড়ছে, তার মুখে অস্পষ্ট সূক্ষ্ম একধরনের হাসি, চোখে আশ্চর্য একধরনের বিস্ময়—

"কী হচ্ছে এখানে?"

হঠাৎ গাছের নিচে থেকে বাজখাঁই একটা ধমক শুনতে পেল বকুল। তার বড়চাচার গলার স্বর, গাছের নিচে বাচ্চাকাচ্চাদের ভিড় দেখে এগিয়ে এসেছেন। হিজল গাছটা নিয়ে কিছু-একটা ঝামেলা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। মুখ ঘুরিয়ে তাকাবেন এক্ষুনি, বকুলকে দেখতে পাবেন সাথে সাথে, মহা একটা কেলেঙ্কারি হবে তখন। বকুল নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেকে আড়াল করে ফেলতে চায় গাছের পাতার আড়ালে।

"কী হল, কথা বলে না কেন কেউ?"

বড়চাচার প্রচণ্ড ধমক খেয়ে সিরাজ আমতা আমতা করে বলল, "না, মানে ইয়ে—"

বকুল বুঝতে পারল আর এখানে থাকা যাবে না, পালাতে হবে। বাচ্চাকাচ্চা যারা আছে তারা নিজে থেকে কখনো বকুলের কথা বলে দেবে না, কিন্তু ধমক খেলে অন্য কথা। বড়চাচার ধমক বিখ্যাত ধমক, বয়স্ক মানুষেরা পর্যন্ত কেঁদে ফেলে। বকুল নিচে তাকাল, নদীর কালো পানি ঘুরপাক খাচ্ছে, ছোট একটা ঘূর্ণির মতো হয়েছে সেখানে। গাছটা অনেকখানি উঁচু, পানি আরও নিচে, এত উঁচু থেকে আগে কখনো পানিতে ঝাঁপিয়ে

পড়েনি, কিন্তু তাতে কী হয়েছে? বকুল নিঃশব্দে হাত উঁচু করে ডাইভ দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়, নদীর পানি ছলাৎ ছলাৎ করে তীরে আঘাত করছে, সেই শব্দের আড়ালে যথাসম্ভব নিঃশব্দে ডাইভ দিতে হবে, ব্যাপারটি এমন কিছু কঠিন নয় তার জন্যে। বকুল গাছের ডালে নিঃশব্দে দোল খেয়ে নিচের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছিপছিপে শরীরে তীরের মতো নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে সে শেষবারের মতো লঞ্চে বসে-থাকা মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটির চোখে আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস, আর্তচিৎকার করে রেলিং ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

পানির নিচে ঝপাং করে অদৃশ্য হয়ে গেল বকুল। দুই হাত দিয়ে পানি কেটে কেটে এগিয়ে যেতে থাকে সে, স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যেতে হবে যতদূর সম্ভব, তারপর ভেসে উঠবে। বড়চাচা কোনদিন জানতেও পারবেন না কে ছিল হিজলগাছে।

কালো পানিতে সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যেতে থাকে বকুল, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পরীর মতো মেয়েটার চেহারা, কী বিচিত্র অবিশ্বাস আর আতঙ্ক ছিল মেয়েটার চোখে! কী ভাবছিল মেয়েটি? তার লাল রুক্ষ চুল, রং-জ্বলা ফ্রক, শ্যামলা রং, শুকনো হাত-পা দেখে মেয়েটার কি হাসি পাচ্ছিল? সে কি হাসছিল মনে-মনে? যারা স্বপ্নের জগতে থাকে তারা কি কখনো ভাবে বকুলের মতো এরকম মেয়েদের কথা? কোন কি কৌতূহল হয় তাদের?

২

নীলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে বলল, "দেখেছ বাবা?"

ইশতিয়াক সাহেব পাশে বসে ছিলেন, তিনিও উঠে দাঁড়ালেন, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মা?"

"একটা—একটা মেয়ে—"

"কী হয়েছে মেয়েটার?"

"পানিতে ডাইভ দিল। কী সুন্দর মেয়েটা বাবা, যেন কেউ গ্রানাইট কেটে তৈরি করেছে। গাছের উপর দাঁড়িয়েছিল।"

"কোথায়? কোন্ গাছে?"

"ঐ যে বাবা ঐ বড় গাছটায় ছিল। এক্ষুনি পানিতে ডাইভ দিল।"

"সত্যি?"

"সত্যি!"

নীলার দুর্বল শরীর উত্তেজনা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না, রেলিং ধরে আবার বসে পড়ে বলল, "কী সুন্দর ডাইভ দিয়েছে তুমি বিশ্বাস করবে না বাবা। ঠিক যেন অলিম্পিকের ডাইভ। একেবারে ডলফিনের মতো—"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ বাবা, এখনও ডুবে আছে মেয়েটা, ভেসে উঠছে না কেন? কিছু হয়নি তো মেয়েটার?"

"কী হবে? গ্রামের মেয়ে তো—এরা একেবারে মাছের মতো সাঁতার কাটে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ মা, সত্যি।"

নীলা একদৃষ্টে নদীর তীরের বিশাল হিজল গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের লঞ্চটি পানিতে ঢেউ তুলে নিচু শব্দ করতে করতে সরে যাচ্ছে। সেখানে পাথর কুঁদে তৈরি করা অপূর্ব মেয়েটি বিশাল একটা গাছ থেকে ডলফিনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে গভীর কালো পানিতে। কী সাহস মেয়েটির! চোখে-চোখে তাকিয়েছিল সে মেয়েটির দিকে, চোখের মাঝে কী জ্বলজ্বলে একধরনের ভাব, দেখে মনে হয় যেন একটা চিতাবাঘ! সমস্ত শরীরটা যেন ইস্পাতের তৈরি ধনুকের ছিলা, টানটান হয়ে আছে! কী সুন্দর! কী চমৎকার! আহা, সেও যদি হত ঐ মেয়েটার মতো—পাথরে কুঁদে তৈরি করা একটা শরীর হত তার? ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে থাকত তার শক্ত একটা শরীর, আর একেবারে আকাশের কাছাকাছি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত নদীর কালো পানিতে! মাছের মতো সাঁতার কাটত ঐ সুন্দর মেয়েটার মতো!

নীলা একটা নিশ্বাস ফেলল। সে জানে কখনোই ঐ মেয়েটার মতো সে হতে পারবে না। তার দুর্বল শরীরের ভিতরে বাসা বেঁধেছে এক ভয়ংকর অসুখ, তিল তিল করে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাকে। এই আকাশ, বাতাস, নদী তার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যাবে কিছুদিন পর। কতদিন পর? এক বছর? ছয় মাস? নাকি আরও কম?

নীলা আবার একটা নিশ্বাস ফেলল। বাবা তার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "কী হয়েছে মা? শরীর খারাপ লাগছে?"

"হ্যাঁ বাবা।"

বাবা উঠে দাঁড়িয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন নীলাকে, বারো বছরের মেয়ে অথচ পাখির পালকের মতো হালকা শরীর। বুকে চেপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ইশতিয়াক সাহেব সারেংকে ডেকে বললেন, "লঞ্চটা ঘুরিয়ে নেন সারেং সাহেব।"

"ঘুরিয়ে নেব? বড় নদীর মোহনায় যাব না?"

"না। মেয়েটার শরীর ভালো লাগছে না।"

"ও আচ্ছা। ঠিক আছে স্যার।"

ইশতিয়াক সাহেব নীলাকে বুকে চেপে নিচে নামিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দেন। মেয়েটি ক্লান্তমুখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। ইশতিয়াক সাহেব মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম গলায় বললেন, "খুব খারাপ লাগছে মা?"

নীলা চোখ খুলে তাকিয়ে ম্লানমুখে হাসার চেষ্টা করে বলল, "না বাবা, খুব টায়ার্ড লাগছে।"

"একটু ঘুমাও। ঘুম থেকে উঠলেই ভালো লাগবে।"

"ঠিক আছে বাবা।"

নীলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। ইশতিয়াক সাহেব একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। পাটাতনে ডেক-চেয়ার সাজানো রয়েছে, রেলিঙে পা তুলে তিনি সেখানে শরীর এলিয়ে দিলেন। রাজহাঁসের মতো সাদা লঞ্চটি তরতর করে পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। অপরাহ্নের রোদ এসে পড়েছে তার চোখে। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুয়ে রইলেন তিনি। মালা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের সর্বময় কর্তা ইশতিয়াক হোসেনকে হঠাৎ কেমন যেন পরাজিত মানুষের মতো দেখাতে থাকে।

দুই বছর আগে চট্টগ্রাম থেকে আসছিলেন তিনি। ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আগে, নিজে ড্রাইভ করছিলেন গাড়ি। নতুন এসেছে তার শেভি ইম্পালা। ভি-এইট ইঞ্জিন,

সান রুফ, অটোম্যাটিক ট্রান্সমিশান—পাশে বসেছে তার স্ত্রী শাহনাজ, পিছনে নীলা। ঢাকা-চট্টগ্রামের নতুন মসৃণ রাস্তায় গাড়িটা প্রায় ভেসে ভেসে যাচ্ছে। গাড়ির সি.ডি. চেঞ্জারে কণিকার একটা রবীন্দ্রসংগীত বাজছে, ইশতিয়াক সাহেব স্টিয়ারিং হুইলে আলতোভাবে হাত রেখেছেন, পাওয়ার স্টিয়ারিঙে আঙুলের স্পর্শে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায়।

ছোট একটা নদীর উপরে হাতির পিঠের মতো একটা ব্রিজ। উপরে উঠে মসৃণ গতিতে নিচে নেমে আসছিলেন, হঠাৎ রাস্তার ঠিক মাঝখানে ছুটে এল সাত আট বছরের একটা ছেলে। রাস্তায় একপাশে ইশতিয়াক সাহেবের বিশাল শেভি ইম্পালা, অন্য পাশ থেকে ছুটে আসছে দৈত্যের মতো একটা ট্রাক। ছেলেটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে, তারপর কী মনে করে ছুটে গেল উলটোদিকে।

প্রথমে চিলের মতো চিৎকার করে উঠল নীলা, তারপর শাহনাজ। যন্ত্রের মতো ব্রেকে চাপ দিলেন ইশতিয়াক সাহেব, দুলে উঠল গাড়িটা, তারপর আধপাক ঘুরে গেল তার বিশাল শেভি ইম্পালা। অমানুষিক ক্ষিপ্রতায় স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন, রাস্তা থেকে বের হয়ে যেতে যেতে গাড়িটা কোনভাবে নিজেকে সামলে নিল আর হঠাৎ করে কোন একটা-কিছুর সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল গাড়িটা, বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ হল, গাড়ির কাচ ভেঙে ছুটে এল তাঁর দিকে। কিছু বোঝার আগে গাড়িটা ওলটপালট খেতে খেতে রাস্তার পাশে দিয়ে গড়িয়ে গেল নিচে—ক্ষেতের দিকে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবিষ্কার করলেন ইশতিয়াক সাহেব বেকায়দাভাবে আটকা পড়েছেন সিটের নিচে, ডান পাটা আটকা পড়েছে কোথাও, ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর শরীর, পিছনে ফিরে তাকালেন ইশতিয়াক সাহেব, গাড়িতে উলটো হয়ে ঝুলছে নীলা। চিলের মতো চিৎকার করছে সে। বেঁচে আছে নীলা চিন্তাটা মাথার মাঝে বিদ্যুৎঝলকের মতো খেলে গেল। মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন স্ত্রী শাহনাজের দিকে—পাশের সিটে মাথা কাত করে শুয়ে আছে, শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। বুক থেকে স্বস্তির একটা নিশ্বাস বের করে জ্ঞান হারালেন ইশতিয়াক সাহেব।

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাবার পর তৃতীয় দিনে তিনি জানতে পারলেন শাহনাজ মারা গেছে। তাঁর আঠারো বছরের স্ত্রী এবং তাঁর একমাত্র মেয়ের মা শরীরে আঘাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না নিয়েও তাঁর প্রিয় শেভি ইম্পালার ধ্বংসস্তূপের মাঝে মারা গেছে একেবারে নিঃশব্দে।

ইশতিয়াক সাহেবের শরীরের প্রায় প্রত্যেকটি হাড় ভেঙে গিয়েছিল, তবু তিনি একরকম জোর করে বেঁচে উঠেছিলেন শুধুমাত্র নীলার জন্যে। বিশাল এই পৃথিবীতে এই মেয়েটির জন্যে নাহলে যে কেউই থাকবে না!

পরের দুই বছরের ইতিহাস খুব দুঃখের ইতিহাস। ইশতিয়াক সাহেব অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন দশ বছরের নীলা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে, একটিবারও জানতে চাইল না তার মা কোথায়। একটিবারও পৃথিবীর এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল না, আকুল হয়ে কাঁদল না তার বাবাকে জড়িয়ে। চারতলা বাসার ছোট জানালার কাচে মুখ লাগিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইশতিয়াক সাহেব তাঁর মেয়েকে ডিজনিল্যান্ড নিয়ে গেলেন, নীলনদের তীরে পিরামিড দেখাতে নিলেন, ল্যুভ মিউজিয়ামে মোনালিসা দেখালেন, কনকর্ডে করে শব্দের চেয়ে

দ্রুতগামী প্লেনে প্যারিস থেকে নিউ ইয়র্কে উড়িয়ে নিলেন, কিন্তু নীলার চোখেমুখে বিষণ্ণতার যে পাকাপাকি ছাপ পড়েছে তার মাকে একটু আঁচড়ও দিতে পারলেন না। এক বছর পর নিউ ইয়র্কের স্লোন ইনস্টিটিউটের একজন ডাক্তার প্রথম ইশতিয়াক সাহেবকে দুঃসংবাদটি দিল। নীলা খুব ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে। এটি সত্যিকার অর্থে কোনো অসুখ নয়, কিন্তু অসুখ থেকে এটি আরও ভয়ংকর কারণ এর কোনো চিকিৎসা নেই। এটি একধরনের মানসিক ব্যাধি, যেখানে মস্তিষ্ক আর বেঁচে থাকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজেই শরীর পুরোপুরি নীরোগ থেকেও ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম যেদিন জানতে পারলেন ইশতিয়াক সাহেব কঠিনমুখে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? কেন এটি আমার মেয়ের হল?"

ডাক্তার মাথা নিচু করে বলল, "আমি খুব দুঃখিত মিস্টার ইশতিয়াক। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার অর্থ কেউ জানে না। কেউ জানে না।"

"এর কোন চিকিৎসা নেই?"

"প্রচলিত মেডিক্যাল সায়েন্সে এর কোন চিকিৎসা নেই।"

"কেউ বাঁচে না এই রোগ হলে?"

ডাক্তার কোন কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

ইশতিয়াক সাহেব প্রায় আর্তনাদ করে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ বাঁচে না?"

"মেডিক্যাল জার্নালে এক-দুইটি কেস পাওয়া গেছে যখন রোগীর ইমিউন সিস্টেম নিজে নিজে রিকভার করেছে। কিন্তু সেগুলি নেহাতই কাকতালীয় ব্যাপার। মেডিক্যাল জার্নালে তো র‍্যাবিজ থেকে আরোগ্য হয়েছে এরকম একটা কেসও ডকুমেন্টেড আছে।"

"আমাদের কিছুই করার নেই? কিছুই করার নেই?"

ডাক্তার কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ খুব মনোযোগ দিয়ে হাতের নখগুলো দেখতে শুরু করল।

"কিছুই কি আমাদের করার নেই? কিছুই?"

ডাক্তার পূর্ণদৃষ্টিতে ইশতিয়াক সাহেবের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তা হলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। আর কিছুই যদি না হয় অন্ততপক্ষে আপনি হয়তো এটা গ্রহণ করার শক্তি পাবেন।"

ইশতিয়াক সাহেব আরকিছু না বলে ডাক্তারের কাছে থেকে উঠে এসেছিলেন। তারপর আরও এক বছর কেটে গেছে। খুব ধীরে ধীরে নীলার শরীর আরও দুর্বল হয়েছে। তার ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মুখ, বড় বড় কালো চোখ, রেশমের মতো কালো চুল দেখলে তাঁকে মোমের পুতুলের মতো মনে হয়। নীলা এমনিতে শান্ত মেয়ে, মা মারা যাবার পর আরও শান্ত হয়ে গিয়েছিল— ইদানীং একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জ্বরে ছটফট করে সে, নিজের কষ্ট নিজের কাছে চেপে রেখে সে বিছানায় চোখ খুলে শুয়ে থাকে। যে-পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে সেই পৃথিবীর জন্যে হঠাৎ হঠাৎ তার বুকের ভিতরে এক বিচিত্র ধরনের মমতার জন্ম হয়।

ইশতিয়াক সাহেব নীলাকে নিয়ে তাঁর বাসায় ফিরে এলেন সন্ধে সাতটায়। নীলাকে নিয়ে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সাথে সাথে ডাক্তার আজমলকে ফোন করলেন। আজমল শুধু পারিবারিক ডাক্তার নন, ইশতিয়াক সাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু, একে অন্যের সাথে তুই-তুই করে কথা বলেন।

আজমল তাঁর ক্লিনিকে খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে আসতে আসতে রাত দশটা বেজে গেল। নীলা তখন তার বিছানায় শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, ইশতিয়াক সাহেব বারান্দায় অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছেন। ডক্টর আজমলকে দেখে ইশতিয়াক সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ছাড়া পেলি শেষ পর্যন্ত?"

"পাইনি কিন্তু চলে এসেছি। আজকাল চিকিৎসাটা প্রয়োজন নয়, ফ্যাশান। নীলার কী খবর?"

ইশতিয়াক সাহেব একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "নতুন কিছু নয়, ঐরকমই আছে। লক্ষে হঠাৎ শরীর খারাপ করল, ভাবলাম তোকে দেখাই।"

"এখন কী ঘুমুচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আর তুলে কাজ নেই। আমি এমনি দেখে যাই, ভোরবেলা এসে ভালো করে দেখব। আরেকটা থরো চেকআপের সময় হয়ে গেছে।"

ইশতিয়াক সাহেব একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, "আর চেকআপ! মেয়েটাকে শুধুশুধু কষ্ট দেওয়া।" ইশতিয়াক সাহেব হঠাৎ করে সুর পালটে বললেন, "আচ্ছা আজমল, তুই বল দেখি আমি কী অন্যায় করেছি যে খোদা আমাকে এমন একটা শাস্তি দিলেন? কী করেছি?"

ডক্টর আজমল এগিয়ে এসে ইশতিয়াক সাহেবের কাঁধ স্পর্শ করে বললেন, "খোদা কাউকে শাস্তি দেয় না রে ইশতিয়াক! জীবনটাই এরকম।"

"কী করি আমি বল দেখি?"

"তুই এখন ভেঙে পড়িস না ইশতিয়াক। নীলার কথা ভেবে তুই এখন শক্ত হ।"

"কী করব আমি?"

ডক্টর আজমল দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "মানুষের ক্লিনিক্যাল একটা ব্যাপার থাকে, আবার সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার থাকে। নীলার সমস্যাটা কী জানিস? মেডিক্যাল সমস্যাটা দেখা দেবার অনেক আগেই সে বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে।"

ইশতিয়াক সাহেব মাথা নাড়লেন, নিচু গলায় বললেন, "একটা মানুষ যে তার মাকে কত ভালবাসতে পারে সেটা নীলাকে আর শাহনাজকে দিয়ে বুঝেছিলাম। বুঝলি আজমল, দুজনকে দেখে মনে হত একজন মানুষ!"

ডক্টর আজমল মাথা নাড়লেন, বললেন, "আমি জানি।"

"মা মারা যাবার শক থেকে আর কখনো রিকভার করেনি।"

"হ্যাঁ। যদি কোনভাবে নীলাকে আবার বেঁচে থাকার জন্যে একটা স্টিমুলেশান দেওয়া যেত!"

ইশতিয়াক সাহেব একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তুই তো জানিস—আমি সব চেষ্টা করেছি। সব। পৃথিবীর কোনকিছু ছেড়ে দিইনি। নীলা কিছু চায় না। একেবারে কিছু না।"

দুইজন দীর্ঘ সময় অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলেন। একসময় ইশতিয়াক সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল যাই নীলার ঘরে। তোর নিশ্চয়ই দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ডঃ আজমল নীলাকে না জাগিয়েই তাকে দেখলেন। ঘুমের মাঝে নীলা ছটফট করে কী-একটা বলল। ডক্টর আজমল মাথা ঝুঁকিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন, ঠিক বুঝতে পারলেন না, মনে হল সে একজনকে বলছে তাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিতে। কিছু-একটা নিয়ে

স্বপ্ন দেখছে নীলা, এতকিছু থাকতে পানিতে ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে স্বপ্ন কেন দেখছে ডক্টর আজমল ঠিক বুঝতে পারলেন না।

৩

বকুনি খেয়ে আজকে বকুলের খুব মন-খারাপ হল। বকুনিটা প্রথমে শুরু করলেন বাবা, সেটাকে বড়চাচা লুফে নিলেন, বকতে বকতে যখন বড়চাচার দম ফুরিয়ে গেল তখন মা শুরু করলেন। বকুনি খেতে খেতে বকুলের এমন অবস্থা হয়েছে যে আজকাল সে ভালো করে খেয়ালও করে না কেন সে বকুনি খাচ্ছে। তাকে উদ্দেশ করে যে-কথাগুলো বলা হয় তার প্রত্যেকটা শুরু হয় এভাবে— 'একটা মেয়ে হয়ে তুই—' ভাবখানা মেয়ে হওয়াটাই অপরাধ, ছেলে হলেই তার সাত খুন মাপ করে দেওয়া হত। বকুনির শেষ পর্যায়ে যখন সবাই মিলে বলতে লাগল তাকে স্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে এসে ঘর-সংসারের কাজে লাগানো হবে তখন তার প্রথমে রাগ এবং শেষের দিকে খুব মন-খারাপ হয়ে গেল। সেইসময় বকুল তার মন-খারাপটা লুকিয়ে রেখে শুধু রাগটা দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে।

নদীর তীরে এসে বকুলের মনটা একটু শান্ত হল। নদীর মাঝে মনে হয় কোন ধরনের জাদু থাকে, রাগ দুঃখ যেটাই থাকুক কেমন করে জানি সেটা কমে আসে। বকুল একা একা নদীর তীর ধরে হেঁটে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল, এদিকে কুমোরপাড়া, তার পরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, এরপর সর্ষেক্ষেত, কিছু ঝোপঝাড় এবং বড় বড় গাছপালা। বছর দুয়েক আগে এখানে একটা গাছে তারাপদ মাস্টার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল বলে কেউ সহজে আসতে চায় না। বকুল নিজেও এদিকে খুব আসে না কিন্তু আজ মন-খারাপ করে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছে। গ্রামের অনেকেই মাঝরাতে এখানে তারাপদ মাস্টারকে বইপত্র নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছে কথাটা মনে পড়তেই বকুলের কেমন জানি ভয়-ভয় করতে লাগল। সে যখন ফিরে চলে আসছিল হঠাৎ মনে হল নদীর কাছে ঝোপের মাঝ থেকে কেউ তাকে শব্দ করে ডাকল। বকুল ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে কোনমতে নিজেকে সামলে নিল, দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

কেউ তার কথার উত্তর দিল না, কিন্তু মনে হল কেউ যেন এবারে পানিতে একটা শব্দ করল। বকুল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, দৌড়ে পালিয়ে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছেকে অনেক কষ্ট করে আটকে রেখে সে সাবধানে এগিয়ে যায়। পা টিপে টিপে ঝোপটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে সে চমকে ওঠে, একজন মানুষ নদীর পানিতে অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে তীরের কাদাপানিতে শুয়ে আছে। বকুল ভয়ে ভয়ে ডাকল, "কে?"

মানুষটা কোন কথা না বলে নিশ্বাস ফেলার মতো একটা শব্দ করল এবং বকুল হঠাৎ চমকে উঠে আবিষ্কার করল এটি মানুষ নয়, এটি একটি শুশুক।

বকুল জন্মের পর থেকে নদীর তীরে তীরে মানুষ হয়েছে, সে অসংখ্যবার শুশুককে পানি থেকে লাফিয়ে উঠতে দেখেছে, এক-দুইবার জেলের জালেও শুশুককে আটকা পড়তে দেখেছে, কিন্তু কখনোই এভাবে ডাঙায় মাথা রেখে কোনো শুশুককে শুয়ে থাকতে দেখেনি। বকুল প্রায় দৌড়ে শুশুকটার কাছে ছুটে গেল, ভেবেছিল শুশুকটা বুঝি সাথে সাথে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে— কিন্তু তা হল না, যেভাবে শুয়ে ছিল সেভাবেই শুয়ে রইল।

বকুল পা টিপে টিপে কাছে এগিয়ে যায়, শুশুকটার মাথাটা দেখে কেমন জানি হাসিহাসি মুখের একজন মানুষের মাথার মতো মনে হয়, চোখ দুটি এত ছোট সেটা দিয়ে কিছু দেখতে পায় বলেই মনে হয় না। ধূসর চকচকে মসৃণ দেহে শুশুকটা নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। বকুল কাছে গিয়ে সাবধানে শুশুকটাকে স্পর্শ করতেই সেটি তার লেজ নেড়ে পানিতে একটা শব্দ করল, শুশুকটাকে দেখে মরে গেছে বলে মনে হলেও সেটা আসলে এখনও মরেনি।

বকুল ভালো করে শুশুকটাকে দেখল, সে জানে এটা পানিতে থাকলেও এবং মাছের সাথে চেহারায় একধরনের মিল থাকলেও এটা মাছ না। এটা কুকুর বেড়াল বা গরু-ছাগলের মতো একটা প্রাণী। কুকুর-বেড়াল বা গরু-ছাগলের যেরকম অসুখ হয় এটার মনে হয় কোনরকম অসুখ হয়েছে। বকুল আবার সাবধানে শুশুকটার শরীর স্পর্শ করল, মসৃণ চামড়া কেমন যেন শুকিয়ে আছে। যে-প্রাণী পানিতে থাকে তার শরীর এভাবে শুকিয়ে থাকা নিশ্চয়ই ভালো ব্যাপার না, শরীরটা ভিজিয়ে দিলে শুশুকটা হয়তো একটু আরাম পাবে। বকুল সাবধানে পাশে নেমে গিয়ে দুই হাতে আঁজলা করে পানি এনে শুশুকটার শরীর ভিজিয়ে দিতে থাকে। শুশুকটা আবার একটা নিশ্বাস নেবার শব্দ করে দুর্বলভাবে একটু নড়ে উঠল এবং ঠিক তখন সে শুশুকটার সমস্যাটা বুঝতে পারল। তার পিঠের কাছে এক জায়গায় একটা ধাতব কী যেন লেগে আছে। শুকনো রক্তের ধারা দুই পাশে শুকিয়ে আছে। বকুল জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "আহা বেচারা!"

শুশুকটা মনে হল তার কথা বুঝতে পারল এবং হঠাৎ মুখটা একটু খুলে নিচু একধরনের শব্দ করল, বকুলের একেবারে পরিষ্কার মনে হল যেন সেটি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে। একটা ছোট বাচ্চা পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলে যেরকম মায়া হয় হঠাৎ করে বকুলের শুশুকটার জন্যে সেরকম মায়া হতে থাকে। সে ভিজে হাত দিয়ে শুশুকটার শরীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে নরম গলায় বলল, "তোমার কোনো চিন্তা নেই শুশুক সোনা, আমি তোমার পিঠ থেকে এই লোহার টুকরাটা তুলে দেব। একেবারে ভালো হয়ে যাবে তুমি, তখন আবার নদীর মাঝে সাঁতার কাটতে পারবে—"

কথা বলতে বলতে সে শুশুকটার পিঠে হাত দিয়ে ধাতব টুকরোটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টানে সেটা খুলে আনল, সাথে সাথে গলগল করে খানিকটা রক্ত বের হয়ে এল। শুশুকটা হঠাৎ ছটফট করে উঠে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করল, বকুলের মনে হল সেটা পানিতে চলে যাবার চেষ্টা করছে। বকুল শুশুকটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করতে করতে আদর করার ভঙ্গিতে বলল, "আহা রে শুশুক সোনা, তোমার ব্যথা লেগেছে? আমি তো ব্যথা দিতে চাইনি, শুধু এটা খুলে দিতে চাইছি! এই তো এখন খুলে গেছে, আর কোন ভয় নেই!"

বকুলের কথা মনে হয় শুশুকটা বুঝতে পারল, এক-দুবার লেজ দিয়ে পানিতে ঝাপটা দিয়ে আবার শান্ত হয়ে গেল। পিঠ দিয়ে এখনও রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে থেমে আসবে একটু পরেই। বকুল আবার হাত দিয়ে আঁজলা করে পানি এনে শুশুকটাকে ভিজিয়ে দিল। একবার চেষ্টা করল সেটাকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিতে, কিন্তু পারল না, মনে হচ্ছে কোন কারণে এটা পানিতে নামতে চাইছে না।

শুশুকের যত্ন করে বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বকুলের দেরি হয়ে গেল, সেজন্যে আবার তার বকুনি খেতে হল। এবারে শুরু হল উলটো দিক দিয়ে— প্রথমে মা তারপর বড়চাচা

সবশেষে বাবা। বিকেলে বকুনি খেয়ে তার যেরকম মন-খারাপ হয়েছিল এখন সেরকম কিছু হল না, পুরো বকুনিটা সে তার এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিল। তার মাথায় তখন শুশুকটির জন্যে চিন্তা। কীভাবে এই ব্যথা-পাওয়া শুশুকটিকে সারিয়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে ভাবনা।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গেল বকুল। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বের হয়ে সে নদীর তীর ধরে হেঁটে যেতে থাকে। ভোরবেলা নদীর ওপরে কেমন কুয়াশা কুয়াশা ভাব, দূরে গাছপালাগুলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। এখনও সূর্য ওঠেনি, পূর্ব দিকে আকাশ লালচে হয়ে আসছে। এক-দুজন মানুষ দাঁতন দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে ইতস্তত হাঁটছে। এত ভোরবেলা বকুলকে দেখে একজন বলল, "কী বকুল? তুই এত ভোরে কী করিস?"

বকুল আমতা আমতা করে বলল, "সকালে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো চাচা। শরীর ভালো থাকে।"

"যাচ্ছিস কোথায়?"

"এই তো হেঁটে আসছি। সকালে হাঁটাহাটি করলে শরীর ভালো থাকে।"

মানুষটি অবাক হয়ে বকুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর বকুল সকালে উঠে হাঁটাহাঁটি করার ভঙ্গি করে কুমোরপাড়ার দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যে-গাছটায় তারাপদ মাস্টার ফাঁসি নিয়েছিল বকুল তার নিচে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল শুশুকটা এখনও আগের জায়গায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। বকুলের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে, মরে গিয়েছে নাকি? পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে সে শুশুকটাকে স্পর্শ করল, সাথে সাথে সেটি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল— না, এখনও বেঁচে আছে। বকুল পানিতে নেমে দুই হাতে আঁজলা করে পানি এনে শুশুকটার শুকনো শরীরটা ভিজিয়ে দিতে শুরু করল। শরীরটা ভিজিয়ে বকুল শুশুকটার পিঠের কাটার জায়গাটার দিকে তাকায়, এখনও লাল হয়ে ফুলে আছে। যে-লোহার টুকরাটা গেঁথেছিল সেটা মনে হয় শ্যালো ইঞ্জিন লাগানো নৌকার প্রপেলারের টুকরা। বকুল পানি দিয়ে শুশুকটার শরীর ভেজাতে ভেজাতে আবার নরম গলায় কথা বলতে থাকে, "আহা বেচারা আমার শুশুক সোনা, কত ব্যথা পেয়েছ তুমি! পিঠের মাঝে গেঁথে গিয়েছে প্রপেলার। এখন আর ভয় কী! এই তো দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবে। আহা বেচারা, খাওয়া হয়নি কতদিন! কী খাও তুমি? নিয়ে আসব তোমার জন্যে খাবার?"

দুপুরবেলা বকুল শুশুকটার জন্যে খাবার নিয়ে এল। শুশুক কী খায় সে জানে না, তবে পানিতে যখন থাকে নিশ্চয়ই মাছ খায়। এখন নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে, মাছ কী চিবিয়ে খেতে পারবে? অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শুশুকের জন্যে সে আলাদা একটা খাবার তৈরি করল। গরুর জন্যে সরিয়ে রাখা ভাতের মাড়, রান্নাঘর থেকে চুরি করা এক গ্লাস দুধ এবং মাছের কুটোকাটা—যেটাকে সে থেঁতলে পিষে একেবারে হালুয়া করে ফেলেছে। তিনটি জিনিস একসাথে মিশিয়ে তার মাঝে সে দুটি প্যারাসিটামল গুঁড়ো করে দিল। মাথাব্যথায় মানুষের জন্যে যদি কাজ করে শুশুকের পিঠের ব্যথার জন্যে কেন কাজ করবে না? শুশুকটাকে কেমন করে খাওয়াবে সে জানে না, তাই সাথে করে একটা ছোট বাটি নিয়ে এল। শুশুকটার মুখ হাঁ করিয়ে সাবধানে সে তার বিশেষ খাবার বাটিতে করে ঢেলে দিতে থাকে। প্রথম এক দুবার মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই সে বেশ ভালো করে খাইয়ে দিতে শুরু করে। শুধু তাই না, মনে হতে থাকে শুশুকটা যেন

বেশ আগ্রহ নিয়েই খাচ্ছে। কয়েকদিন থেকেই নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে। বকুলের শুশুকটার জন্য এত মায়া হল সেটি আর বলার মতো নয়। খাওয়ানো শেষ করে সে পানি দিয়ে আবার শুশুকটার সারা শরীর ভিজিয়ে দিতে শুরু করে, মাথায় গলায় হাত বুলাতে বুলাতে নরম গলায় আদর করে কথা বলতে থাকে।

বিকেলবেলা বকুল আবার খাবার নিয়ে এল। দুপুরবেলা পাড়ার সব বাচ্চাকাচ্চাদের মাছ ধরতে লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা ছাঁকা জালে নদীর পাশে খাল এবং ডোবার ছোট মাছ ধরেছে, মাছের সাথে কাঁকড়া, ব্যাং, শামুক, গুগলিও উঠে এসেছে। সবগুলিকে থেঁতলে পিষে নিয়ে তার সাথে আবার মিশিয়েছে ভাতের মাড়, দুধ আর প্যারাসিটামল। বাবার তোশকের নিচে ফোড়ার কী-একটা ওষুধ ছিল সেটাও সে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিল, মানুষের ঘা যদি এই ওষুধ খেলে ভালো হতে পারে তাহলে শুশুকের কেন ভালো হবে না? যেসব বাচ্চাকাচ্চা মহাউৎসাহে মাছ ধরেছে, সেগুলোকে পিষতে বকুলকে সাহায্য করেছে তারা সবাই খুব উৎসাহী ছিল জিনিসটা নিয়ে কী করা হয় সেটা দেখার জন্যে। কিন্তু বকুল এই মুহূর্তে ঠিক তাদের বিশ্বাস করতে পারল না। সবাইকে নিয়ে মাঠে দাড়িয়াবান্দা খেলা শুরু করিয়ে সে সটকে পড়ল। প্লাস্টিকের একটা বোতলে এই বিশেষ খাবার নিয়ে সে আবার ছুটে গেল শুশুকের কাছে। এবারে সে একটা পরিবর্তন লক্ষ করল, শুশুকটা তার শরীরের বেশির ভাগ পানিতে ডুবিয়ে রেখে শুধু মাথাটা শুকনো ডাঙায় ঠেকিয়ে রেখেছে। বকুল কাছে বসে শুশুকটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মুখ হাঁ করিয়ে আবার তাকে খাইয়ে দিল। বকুল বেশ উৎসাহ নিয়ে আবিষ্কার করল যে এবার শুশুকটার মাঝে খানিকটা জীবনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—এটা এর লেজ নাড়ছে এবং খাবারের বাটিটা মুখের কাছে আনতেই সেটা খাবার জন্যে নিজেই মুখটা অল্প খুলে ফেলছে। বকুল শুশুকটার মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে আবার অনেকক্ষণ আদর করে নরম গলায় কথা বলল। বকুলের ভুলও হতে পারে কিন্তু তার কেন জানি স্পষ্ট মনে হল শুশুকটা তার কথা একটু একটু বুঝতে পারছে।

পরদিন ভোরে আবার কেউ ঘুম থেকে জাগার আগেই বকুল ছুটে ছুটে শুশুকটাকে দেখতে এল। তারাপদ মাস্টার যে-গাছে গলায় দড়ি দিয়েছিল তার নিচে দাঁড়িয়ে বকুল নদীর তীরে উঁকি দিয়ে দেখল শুশুকটা সেখানে নেই। শুশুকটা নিশ্চয়ই ভালো হয়ে চলে গেছে, বকুলের আনন্দ হবার কথা ছিল, কিন্তু কেন জানি আনন্দ না হয়ে তার একটু মন-খারাপ হয়ে গেল, শুশুকটার উপরে তার এত মায়া পড়ে গিয়েছে যে সে আর বলার নয়। বকুল খানিকক্ষণ নদীতে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পা দিয়ে পানিতে শব্দ করল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে নদী থেকে উঠে এল। শুশুকটা চলেই গেল শেষ পর্যন্ত, তাকে শেষবারের মতো ভালো করে একবার আদরও করে দিতে পারল না!

বকুল মন-খারাপ করে নদীর তীর ধরে হাঁটতে থাকে, সামনে কিছু ঝোপঝাড়, তারপর সর্ষেক্ষেত, সর্ষেক্ষেতের পর কুমোরপাড়া শুরু হয়েছে। বকুল সর্ষে- ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ নদীর পানিতে ছলাৎ করে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, পানিতে আধাডোবা হয়ে শুশুকটা ভেসে আছে, দেখে মনে হচ্ছে বকুলকে কিছু বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বকুল ছোট একটা চিৎকার দিয়ে পানিতে ছুটে গেল, শুশুকটা ভয় পেয়ে সরে গেল না, বরং লেজ নেড়ে একটু এগিয়ে এল। বকুল হাত দিয়ে শুশুকটার মাথায় থাবা দিয়ে বলল, "আরে শুশুক সোনা! তুই এসেছিস? এসেছিস আমার কাছে?"

শুশুকটা আরেকটু এগিয়ে এসে তার মাথা দিয়ে বকুলকে একটা ছোট ধাক্কা দেয়, মনে হয় এটা তার ভালোবাসা প্রকাশের একটা ভঙ্গি। বকুল গলায় হাত বুলিয়ে আদর করার মতো গলায় বলল, "আরে আমার শুশকি টুশকি! আমি ভাবলাম তুই আর কোনদিন আসবি না ! ভালো হয়ে চলে গেছিস !"

শুশুকটা আবার তার মাথা দিয়ে বকুলকে ছোট একটা ধাক্কা দিল। বকুল তার গলায় মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "খুব সাবধানে থাকিস শুশকি টুশকি। শ্যালো নৌকার নিচে আর যাবি না, লঞ্চের ধারেকাছে আসিস না। যখন বড় জাল দিয়ে মাছ ধরবে তুই দূরে দূরে থাকিস। ভালো করে খাবি। তুই কী খাস সেটা তো জানি না তবে যেটাই খাস ভালো করে খাবি। পেট ভরে খাবি। ঠিক আছে?"

শুশুকটা পানি থেকে মাথা উপরে তুলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। বকুল শুশুকটার মসৃন চকচকে শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "দুষ্টুমি করবি না শুশুকি টুশকি। মারপিট করবি না। পিঠের ঘা'টা সারতে মনে হয় সময় নেবে, লক্ষ রাখিস। কোনকিছু দরকার হলে চলে আসিস আমার কাছে, ঠিক আছে টুশকি?"

হঠাৎ দূর থেকে কে যেন বলল, "কী রে বকুল, এত সকালে পানিতে নেমে কী করছিস ?"

বকুল মাথা তুলে দেখল, গরু নিয়ে যাচ্ছেন রহমত চাচা। এত দূর থেকে শুশুকটাকে নিশ্চয়ই দেখেননি। বকুল ফিসফিস করে শুশুকটাকে বলল, "যা টুশকি যা। চলে যা এখন। কেউ দেখলে সমস্যা হয়ে যাবে !"

বকুল পানি থেকে উঠে আসতে শুরু করতেই শুশুকটা লেজ নেড়ে নদীর গভীরে চলে যেতে শুরু করল। রহমত চাচা কাছাকাছি গরুটার লেজ মুচড়ে দিয়ে বললেন, "একলা একলা কার সাথে কথা বলিস?"

"কারও সাথে না। পায়ে গোবর লেগেছিল তাই ধুতে গিয়েছিলাম।"

রহমত চাচা হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বললেন, "পাগলি মেয়ে! আমি দেখলাম তুই বিড়বিড় করে কথা বলছিস। বড় হয়ে তুইও আরেকটা জমিলা বুড়ি হবি নাকি?"

বকুল দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে শুরু করল।

৪

নীলা বিছানায় হেলান দিয়ে বসে আছে, তার বুক পর্যন্ত একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। তার মাথার কাছে কালো টেবিলের উপর একটা কাচের ট্রে। সেই ট্রে'র উপরে ক্রিস্টালের গ্লাসে কমলার রস। হাফপ্লেটে রুটির উপর মাখন লাগানো, দুটি আপেল। বিছানায় তার পায়ের কাছে ইশতিয়াক সাহেব বসে আছেন। তিনি একটু এগিয়ে এসে নীলার কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে বললেন, "কিছুই তো খেলি না মা!"

"খেতে ইচ্ছে করে না বাবা।"

"ইচ্ছে না করলেও তো খেতে হয়। নাহয় শরীরে জোর পাবি কেমন করে?"

নীলা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আর শরীরে জোর পাব না আব্বু। আমি জানি।"

ইশতিয়াক সাহেব মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ছি! এভাবে কথা বলে না মা।"

"কী হয় বললে ? এটা তো সত্যি। আমি তো মরে যাব বাবা। আমি জানি, তুমি জান, সবাই জানে।"

"এভাবে কথা বলে না। ছি মা!"

"আমি কবে মারা যাব সেটাও আমি জানি।"

"ছি মা, এভাবে কথা বলে না!"

নীলা হঠাৎ দুই হাত দিয়ে তার বাবার হাত ধরে বলল, "ঠিক আছে আব্বু, বলব না। আর কখনো বলব না।"

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে বসে থাকে। ইশতিয়াক সাহেব— মালা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সর্বময় কর্তা, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের বড় বড় মানুষের সাথে যে-কোন সময় যে-কোন পরিবেশে কথা বলতে পারেন, কিন্তু হঠাৎ করে নিজের বারো বছরের মেয়ের সামনে আর কথা বলার কিছু খুঁজে পেলেন না। নীলা খানিকক্ষণ তার বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার শুধু তোমার জন্যে চিন্তা হয় আব্বু। আমি তো আম্মুর সাথে থাকব। তুমি একা একা কেমন করে থাকবে?"

ইশতিয়াক সাহেবের চোখে হঠাৎ পানি চলে আসতে চায়। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বললেন, "তুই তোর আম্মুকে কখনো স্বপ্নে দেখিস মা?"

"রোজ স্বপ্নে দেখি। রোজ।"

"কী দেখিস ?"

"আমার সাথে রোজ রাতে কথা বলে আম্মু। আমাকে নিয়ে কোথায় কোথায় যাবে সেইসব বলে। আমার জন্যে আম্মু অপেক্ষা করছে।"

ইশতিয়াক সাহেব একটা নিশ্বাস ফেলে কথাটা ঘোরানোর জন্যে বললেন, "তুই কোথাও যেতে চাস মা?"

"না আব্বু, যেতে চাই না।"

"কিছু কিনবি? কোনো বই? ভিডিও-সিডি?"

"না আব্বু। কিছু লাগবে না।"

"কারও সাথে দেখা করবি? কথা বলবি? তোর কোন বন্ধুকে ডাকব?"

"না-না- আব্বু, কাউকে ডেকো না। আমার ভালো লাগে না।"

ইশতিয়াক সাহেব আবার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "দুপুরবেলা তোর আজমল চাচা আসবে।"

"ঠিক আছে।"

"তোর শরীর কেমন লাগছে তার সবকিছু বলিস আজমল চাচাকে।"

"বলব।"

"আমি একটু অফিস থেকে ঘুরে আসি, কিছু লাগলেই ফোন করে দিবি।"

"দেব আব্বু।"

ইশতিয়াক সাহেব দরজা খুলে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ নীলা বলল, "আব্বু—"

"কী মা ?"

"তোমার মনে আছে আমরা একদিন লঞ্চ করে যাচ্ছিলাম?"

"হ্যাঁ মা।"

"একটা মেয়ে— মনে আছে— একটা গাছের উপর থেকে পানিতে ডাইভ দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ মা, মনে আছে।"

"মেয়েটা কী সুন্দর ছিল, না আব্বু? কী গ্রেসফুল! কী এনার্জেটিক!"

নীলা আরও কিছু বলবে ভেবে ইশতিয়াক সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু নীলা আরকিছু বলল না। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই সুন্দর ছিল মেয়েটা। আমি তো দেখিনি, কিন্তু তুই তো দেখেছিস। তুই যখন বলছিস নিশ্চয়ই ছিল।"

ইশতিয়াক সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে কী মনে করে আবার ফিরে এসে বললেন, "তুই মেয়েটার সাথে দেখা করবি মা?"

"আমি? দেখা করব?"

"হ্যাঁ। করবি?"

নীলা হঠাৎ কেমন যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল, বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "করব? দেখা করে কী বলব তাকে?"

"যেটা ইচ্ছে হয় বলবি!"

"আমাকে দেখে কি হাসবে?"

"কেন? হাসবে কেন?"

"এই যে আমার এত অসুখ। গায়ে জোর নেই।"

"ধুর! সেজন্যে কেউ হাসে নাকি? মানুষের কি অসুখ হয় না? আর ভালো করে একটু খাবি তা হলেই তো জোর হবে।"

"তা হলে তুমি কী বল বাবা? আমরা কি যাব?"

"চল যাই। আমি ফোন করে দিচ্ছি, এখনই রওনা দেব।"

"তোমার অফিস?"

"আরেকদিন যাব অফিসে।"

চন্দ্রা নদীর তীরে পলাশপুর গ্রামের বাচ্চাকাচ্চারা হিজল গাছের নিচে লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছিল, হঠাৎ তারা দেখতে পেল রাজহাঁসের মতো দেখতে অপূর্ব একটা লঞ্চ প্রায় নিঃশব্দে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে দেখতে পেল সিরাজ, সে অন্যদের দেখতেই সবাই খেলা বন্ধ করে লঞ্চটার দিকে তাকিয়ে রইল। সবাই ভেবেছিল লঞ্চটা কাছাকাছি এসে ঘুরে যাবে, কিন্তু সেটা ঘুরে গেল না, সত্যি সত্যি তাদের দিকে আসতে শুরু করল। লঞ্চের সামনে একজন মানুষ বাঁশ দিয়ে নদীর পানি আন্দাজ করছে। তীরের কাছাকাছি এসে মানুষটা লঞ্চ থেকে নেমে সেটাকে দড়ি দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বেঁধে ফেলল, তখন সবাই লক্ষ করল উপরে রেলিঙের কাছে সাহেবদের চেহারার মতো একজন মানুষ এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে পুতুলের মতো দেখতে একটা মেয়ে। মানুষটার মাথায় চোখে যেন রোদ না লাগে সেরকম বারান্দাওয়ালা একটা টুপি। মানুষটা ইশতিয়াক সাহেব। তিনি উপর থেকে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হাসিহাসি মুখে বললেন, "তোমরা এখানকার?" বাচ্চাদের কারও কথা বলার সাহস হল না। এক-দুইজন ভয়ে মাথা নাড়ল।

ইশতিয়াক সাহেব আবার বললেন, "আমরা এখানে একজনকে খুঁজতে এসেছি। একটা মেয়ে, খুব সাহসী মেয়ে! এই যে গাছটা আছে সেটার একেবারে উপর থেকে নদীতে ডাইভ দিতে পারে।"

সাহেবদের মতো দেখতে ফরসা মানুষটি কার কথা বলছে বুঝতে বাচ্চাদের কারও এতটুকু দেরি হল না। তারা প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে বলল, "বকুলাপ্পু।"

"কী নাম বললে? ব–ব–"

"বকুলাপ্পু।"

"বকু-লাপ্পু?"

"হ্যাঁ।" সিরাজ এবার সাহস করে কথা বলার দায়িত্বটুকু নিয়ে নিল। বলল, "তার নাম হল বকুল। আমরা সবাই বকুল আপু ডাকি।"

"ও!" ইশতিয়াক সাহেব হা হা করে হেসে বললেন, "বকুল আপু থেকে বকুলাপ্পু!"

ব্যাপারটা সাহেবের মতো চেহারার মানুষটাকে বোঝাতে পেরেছে সেই আনন্দে সিরাজ চোখ ছোট ছোট করে হেসে ফেলল। সে শরিফকে টেনে সামনে এনে বলল, "এই যে শরিফ। বকুলাপ্পুর ছোট ভাই।"

"ও! তুমি বকুলাপ্পুর ছোট ভাই।" ইশতিয়াক সাহেব হেসে বললেন, "আমরা তোমার বোনের সাথে দেখা করতে এসেছি।"

শরিফ পাংশুমুখে বলল, "কী করেছে বকুলাপ্পু?"

"কিছু করেনি! আমরা এমনি দেখতে এসেছি। কোথায় আছে বলবে?"

সিরাজ বলল, "ডেকে নিয়ে আসি?"

সিরাজের কথা শেষ হবার আগে শরিফ এবং আরও আট-দশজন বকুলকে ডাকার জন্যে গুলির মতো ছুটে গেল। তাদের গ্রামে এত বড় ব্যাপার এর আগে কবে ঘটেছে কেউ মনে করতে পারে না।

বাড়িতে তখন বকুলকে বকাবকি করা হচ্ছিল। রহমত চাচার পাগলি গাইটি কীভাবে জানি ছুটে গেছে, গ্রামের দুর্ধর্ষ মানুষেরা এই গাইয়ের ধারেকাছে যায় না, বকুল সেটাকে ধরার চেষ্টা করে পিছুপিছু ছুটে গিয়েছিল। গাইটি পথেঘাটে যত অনর্থ করেছে এখন তার সব দোষ এসে পড়েছে বকুলের ঘাড়ে। বকুলকে জন্ম দিতে গিয়ে মা কেন মরে গেলেন না সেটা চতুর্থবারের মতো বলে মা পঞ্চমবারের মতো বলতে শুরু করছিলেন তখন ছুটতে ছুটতে শরিফ এবং বাচ্চাকাচ্চার দল এসে হাজির। শরিফ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বকুলাপ্পু— সাংঘাতিক জিনিস হয়েছে।"

"কী?"

"একটা সাহেবের মতো লোক— ঐ যে সাদা লঞ্চে করে যায় সে তোমাকে খুঁজছে।"

"আমাকে?" বকুল মনে করার চেষ্টা করতে থাকে কীভাবে সে সাদা লঞ্চের মানুষের সাথে একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ল।

বড়চাচি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবারে চোখ কপালে তুলে বললেন, "ও মা গো! কী ডাকাতে মেয়ে! লঞ্চওয়ালার সাথে গোলমাল করে এসেছে!"

বকুল তেজি ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছু করি নাই।"

"তা হলে কেন তোকে ডাকছে?"

"আমি কেমন করে বলব?"

শরিফ এবং অন্যেরা বকুলের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, "চলো বকুলাপ্পু। চলো। তাড়াতাড়ি চলো!"

মা এবং বড়চাচি দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে বসে রইলেন এবং তার মাঝে বকুল বাচ্চাদের নিয়ে নদীর ঘাটের দিকে চলল। বকুল দূর থেকে দেখতে পেল লঞ্চের উপর

পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটা বসে আছে, তাঁকে দেখে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাহেবদের মতো দেখতে একজন মানুষ, সেই মানুষটা বকুলকে দেখে লঞ্চ থেকে নেমে এসে বললেন, "তুমি হচ্ছ বিখ্যাত বকুলাঞ্জু?"

বকুল হঠাৎ করে একটু লজ্জা পেয়ে যায়। মানুষটি বকুলের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "তুমি একদিন ঐ গাছ থেকে নদীর পানিতে ডাইভ দিয়েছিলে, সেটা দেখে আমার মেয়ে এত মুগ্ধ হয়েছে যে সে তোমার সাথে পরিচয় করতে এসেছে।"

বকুল অবাক হয়ে মানুষটির দিকে তাকাল, যে-কাজটিকে প্রত্যেকটি মানুষ একটা বড় ধরনের দুষ্টুমি হিসেবে ধরে নেয়ে, তার জন্যে বকুনি থেকে শুরু করে বড় ধরনের পিটুনি পর্যন্ত খেতে হয়, সেই কাজটি করেছে বলে তাকে দেখতে এসেছে একটি মেয়ে! আর মেয়েটি হ্যানো তেনো কোন মেয়ে নয়—একেবারে সেই স্বপ্নজগতের একটা মেয়ে।

সাহেবদের মতো লম্বা-চওড়া ফরসা মানুষটা বকুলের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আমার মেয়েটি নিজেই নেমে আসত, কিন্তু আসলে তার শরীরটি ভালো নয়।"

বকুল ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হয়েছে?"

ফরসা মানুষটি একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তার একটা অসুখ করেছে। একটা কঠিন অসুখ। খুব দুর্বল সেজন্যে।"

বকুল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার মানুষটির দিকে আরেকবার পুতুলের মতো মেয়েটির দিকে তাকাল। এরকম ফুলের মতো সুন্দর একটা মেয়ের কখনো কি অসুখ করতে পারে?

"তুমি আসবে একটু আমার সাথে? আমার মেয়ে তোমার সাথে পরিচয় করার জন্যে বসে আছে।"

বকুল মাথা নাড়ল। তারপর মানুষটার পিছুপিছু লঞ্চের উপরে উঠল। অনেকদিন আগে একবার সে লঞ্চে করে সদরঘাট গিয়েছিল, কী ভয়ানক ভিড় ছিল সেই লঞ্চে, কী ঘিঞ্জি নোংরা একটা লঞ্চ! আর তার তুলনায় এটা একেবারে একটা ছবির মতো, সাদা ধবধব করছে, দেখে মনে হয় এটি বুঝি সত্যিকারের লঞ্চ নয়, বুঝি একটা খেলনা।

সাহেবদের মতো লম্বা-চওড়া ফরসা মানুষটি বকুলের হাত ধরে সাবধানে উপরে নিতে নিতে বলল, "আমার নাম ইশতিয়াক আহমেদ, আর আমার মেয়ের নাম হচ্ছে নীলা।" বকুল ভাবল সে একবার জিজ্ঞেস করবে নীলার কী অসুখ করেছে কিন্তু ততক্ষণে উপরে চলে এসেছে তাই আর জিজ্ঞেস করতে পারল না। ইশতিয়াক সাহেব নীলার কাছাকাছি গিয়ে বললেন, "নীলা, এই হচ্ছে বকুল, আর বকুল, এই হচ্ছে নীলা।"

বকুল কী বলবে বুঝতে পারল না, সে ছোট ছোট দুষ্টু ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে-কোনরকম দুরন্তপনা করতে পারে, গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে পারে, পাজি ছেলেদের ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারে—কিন্তু এরকম একটা ছবির মতো সুন্দর লঞ্চের দোতলায় পুতুলের মতো একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে কী কথা বলতে হবে সে বুঝতে পারল না। দুজন দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তখন নীলা বলল, "আমি যে এরকম করে এসেছি তুমি কি রাগ হয়েছ?"

বকুল অবাক হয়ে বলল, "কেন, রাগ হব কেন?'

"না, আমি ভাবলাম কোনোরকম খবর না দিয়ে অচেনা একজন মানুষ হঠাৎ করে—"

"আমি তোমাকে চিনি।"

নীলা অবাক হয়ে বলল, "তুমি আমাকে চেন?"

"হ্যাঁ। আমি তোমাকে অনেকবার দেখেছি তুমি এই লঞ্চে করে যাচ্ছ।"

"আমিও তোমাকে দেখেছি ঐ গাছের উপর থেকে তুমি ডাইভ দিচ্ছ। ইশ! তোমার ভয় করে না?"

বকুল ফিক করে হেসে বলল, "একটু একটু করে।"

নদীর ঘাটে ততক্ষণে অনেক বাচ্চার ভিড় জমে গেছে, সবাই লঞ্চে ওঠার জন্যে উসখুস করছে কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। ইশতিয়াক সাহেব রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি আসতে চাও?"

তার কথা শেষ হবার আগেই ডজনখানেক বাচ্চা হুড়মুড় করে লঞ্চের দিকে ছুটে যেতে থাকে, ধাক্কাধাক্কি করে কে কার আগে যাবে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, উপর থেকে কোন-একজন নিচে পড়ে যাবে সেই ভয়ে ইশতিয়াক সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। কয়েক সেকেন্ড পরে চোখ খুলে দেখলেন বকুল আর নীলাকে ঘিরে সব বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে— কেউ পড়ে যায়নি! বকুল আর নীলা কী নিয়ে কথা বলে সেটা শোনোর জন্যে তারা একটা নিঃশব্দ কৌতূহল নিয়ে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

বকুল জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাকি অসুখ করেছে?"

নীলা মাথা নাড়ল।

বকুল মাথা নেড়ে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "কোন চিন্তা কোরো না। সবারই কোন-না-কোন অসুখ হয়।"

বকুল এবং নীলাকে ঘিরে যে বিশাল দর্শকমণ্ডলী দাঁড়িয়ে ছিল তারা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, আজিজ বলল, "আমার গত সপ্তাহে জ্বর হয়েছিল।"

কালাম বুক ফুলিয়ে বলল, "আমার গত বছর ডিসি হয়েছিল।"

জাহানারা ফিসফিস করে বলল, "আমার ম্যালেরিয়া।"

সিরাজ রতনকে দেখিয়ে হিহি করে হেসে বলল, "আর রতনের সারা বছর অসুখ থাকে। পেটের অসুখ নাহলে জ্বর নাহলে পাঁচড়া।"

নীলা মাথা নেড়ে বলল, "আমার অসুখটা সেরকম অসুখ না।"

"তা হলে কীরকম অসুখ?"

"এটা আসলে— এটা—" নীলা ইতস্তত করে বলল, "এটা কোনদিন ভালো হবে না।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আজিজ বলল, "ডাক্তার দেখালেই তো অসুখ ভালো হয়।"

নীলা একটু হেসে বলল, "পৃথিবীর সব ডাক্তার দেখানো হয়েছে। এই অসুখটার কোন চিকিৎসা নেই।"

বাচ্চাদের দলটার মাঝে রতনকে সবচেয়ে বোকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে নিজের সুনামটা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই মনে হয় বলল, "তা হলে কি এখন তুমি মরে যাবে?"

বকুল সাথে সাথে রতনের কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "গাধার মতো কথা বলিস কেন?"

রতন নিজের কান বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "চিকিৎসা না হলে মানুষ মরে যায় না? মনে নাই জব্বার চাচা—"

ইশতিয়াক সাহেব অসহায়ভাবে বাচ্চাদের আলোচনাটি শুনে যাচ্ছিলেন—এত খোলামেলাভাবে এরকম একটা বিষয় নিয়ে মনে হয় শুধু বাচ্চারাই আলোচনা করতে

পারে। তিনি বিষয়টা পালটানোর চেষ্টা করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নীলা বলল, "আসলে ঠিকই বলেছে ও। আমি কয়েকদিনের মাঝে মরে যাব।"

সাজ্জাদ এই দলটার মাঝে সবচেয়ে ধার্মিক মানুষ, গত রোজায় সে ত্রিশটা রোজা রেখেছে, এর মাঝেই নিজে নিজে দশ পারা কোরান শরিফ পড়ে ফেলেছে। সে এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "হায়াত-মউত আল্লাহ্‌র হাতে। কে কখন মারা যাবে কেউ বলতে পারে না।"

নীলা হাসিহাসি মুখে বলল, "আমি পারি।"

সাজ্জাদ মাথা নেড়ে বলল, "এইরকম করে কথা বলা ঠিক না। আল্লাহ্ নারাজ হবে। আল্লাহ্ চাইলে সব অসুখ ভালো হয়ে যায়।"

বকুল এবং অন্য সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকে। সাজ্জাদ উৎসাহ পেয়ে বলল, "যখন কঠিন অসুখ হয় তখন সদকা দিতে হয়।"

"সদকা?"

"হ্যাঁ, জানের সদকা দিতে হয় জান দিয়ে। মনে করো আল্লাহ্ ঠিক করেছে এই অসুখটা দিয়ে তোমার জান নেবে। তখন একটা মুরগি কিনে সেটাকে সদকা দিতে হয়। বলতে হয় আল্লাহ্ তুমি আমার জান না নিয়ে এই মুরগির জানটা নাও। আল্লাহ্ তখন মুরগির জান নিয়ে তোমার অসুখ ভালো করে দেবে।"

আজিজ জিজ্ঞেস করল, "মুরগি সদকা কি দেওয়া হয়েছে?"

নীলা মনে হল মুখের হাসি গোপন করে বলল, "না, দেওয়া হয়নি।"

"দেওয়া উচিত ছিল।"

বকুল বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, আমরা আজকেই তোমার জন্যে একটা মুরগি সদকা দেব।"

উপস্থিত অন্য সবাই মাথা নাড়ল এবং ঠিক তখন নদীর তীর থেকে কে- একজন চিৎকার করে উঠল, "শুশুক, শুশুক—"

সবাই লঞ্চের রেলিং ধরে নিচে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল একটা বিশাল শুশুক লঞ্চটার কাছে ভেসে ভেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তীর থেকে একজন চিৎকার করে বলল, "মার, মার শালাকে!"

কেন শুশুককে মারতে হবে কেউ পরিষ্কার করে বুঝতে পারল না, কিন্তু সাথে সাথে লোকজন ঢিল পাথর হাতে নিতে শুরু করে, কে-একজন একটা কোঁচ নিয়ে আসার জন্যে ছুটতে থাকে।

বকুল নিচে তাকাল এবং সাথে সাথে শুশুকটাকে চিনতে পারল, লঞ্চের উপর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পিঠের আঘাতের চিহ্ন। সে চিৎকার করে বলল, "না—না—না, কেউ মেরো না।"

তার কথা শেষ হবার আগেই দুটি ঢিল ছুটে আসতে থাকে এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই বকুল রেলিঙের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর পানিতে ঝপাং করে সে ডুবে যায়, কয়েক মুহূর্ত পরে সে যখন ভেসে উঠল সবাই অবাক হয়ে দেখল শুশুকটার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে এবং শুশুকটা প্রাণের বন্ধুকে যেভাবে আদর করে সেভাবে বকুলকে তার মুখ দিয়ে আদর করে যাচ্ছে।

লঞ্চের উপর ইশতিয়াক সাহেব, নীলা, ডজনখানেক বাচ্চা, নদীর তীরে জনা-দশেক মানুষ সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সবার আগে কথা বলল নীলা, জিজ্ঞেস করল, "তু-তুমি এটাকে চেন?"

বকুল মুখের উপর থেকে ভিজে চুল সরিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এটা আমার বন্ধু।"

"বন্ধু? বন্ধু! কী নাম?"

"টুশকি।"

"টুশকি! ইশ কী সুন্দর নাম! আমি টুশকিকে ছুঁতে পারি?"

রতন মাথা নেড়ে বলল, "কামড় দেবে। কামড় দিয়ে কপ করে মাথাটা খেয়ে ফেলবে।"

"ধুর গাধা!" আজিজ ধমক দিয়ে বলল, "শুশুক তো মাছ, মাছ কি কামড় দেয়? বকুলাপ্পুকে কি কামড় দিচ্ছে?"

জাহানারা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "বকুলাপ্পুকে বাঘও কামড় দেবে না। আমরা গেলে কপ করে খেয়ে ফেলবে।"

নীলা উপর থেকে আবার চিৎকার করে বলল, "আমি টুশকিকে ছোঁব।"

বকুল টুশকির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "নিচে পানিতে আসতে হবে।"

নীলা জ্বলজ্বলে চোখে ইশতিয়াক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা আমি যাই নিচে? পানিতে?"

ইশতিয়াক সাহেব অবাক হয়ে নীলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শাহনাজ মারা যাবার পর মেয়েটি একেবারে সবকিছুতে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল, কত চেষ্টা করেও কোনকিছুতেই এতটুকু আগ্রহ বা কৌতূহল জাগাতে পারেননি। দুই বছর পর এই প্রথমবার সে কিছু-একটা করতে চাইছে। শুধু যে করতে চাইছে তাই নয়, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে দিচ্ছে। তিনি নরম গলায় বললেন, "যেতে চাইলে যা মা। আমি আসব?"

"আসতে হবে না বাবা, আমি নিজেই পারব।"

ইশতিয়াক সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন দুর্বল শরীরে নীলা লঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে, তার সামনে পিছনে ছোট ছোট বাচ্চারা তাকে ধরে রেখেছে যেন পড়ে না যায়। নিচে কাদামাটি, তার কাছে ঘোলা পানি, সেখানে হাঁটতে হাঁটতে প্যারিস থেকে কেনা তার সাদা জুতো কাদায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে, নিউইয়র্কের ম্যাসিতে এই ফ্রকটা কিনেছিলেন আড়াইশো ডলার দিয়ে, নদীর ঘোলা পানিতে ভিজে একাকার হবে এক্ষুনি! কিন্তু ইশতিয়াক সাহেব সেদিকে দেখছিলেন না, তিনি তাকিয়ে ছিলেন নীলার মুখের দিকে, কী অপূর্ব প্রাণশক্তিতে হঠাৎ করে সেটা জ্বলজ্বল করছে। নিশ্বাস বন্ধ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি নিচু গলায় ডাকলেন, "শমশের—"

সাথে সাথে সারেঙের ঘর থেকে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বের হয়ে এল, বলল, "স্যার, আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ। তুমি যাও, ডক্টর আজমলকে নিয়ে এসো। যেভাবে হোক। কতক্ষণ সময় লাগবে?"

"এক ঘণ্টা লেগে যাবে স্যার।"

"এক ঘন্টায় পারবে নিয়ে আসতে?"

"যদি ডাক্তার সাহেবকে খুঁজে আনতে না হয় তা হলে পারব স্যার।"

"ভেরি গুড! যাও। বলবে খুব জরুরি। খুব খুব জরুরি।"

বকুল পানিতে শুশুকটার গলা জড়িয়ে ভেসে আছে, তাকে ঘিরে আরও কিছু বাচ্চা হুটোপুটি করছে। ইশতিয়াক সাহেব লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। বেশ কয়েকজন মিলে নীলার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ইশতিয়াক সাহেব বুকের মাঝে একধরনের

কাঁপুনি অনুভব করতে থাকেন। ফুলের মতো কোমল তাঁর এই মেয়েটার যদি কিছু-একটা হয়? শুশুকের শক্তিশালী লেজের ঝাপটায় যদি সে আছড়ে পড়ে ডুবে যায় পানিতে, নদীর স্রোতে যদি ভেসে যায় খড়কুটোর মতো?

নীলা শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে, কাঁপতে কাঁপতে সে মাছের টুকরোটা উঁচু করে ধরে রাখল আর শুশুকটা হঠাৎ পানির নিচে থেকে লাফিয়ে উঠে ওর হাত থেকে মাছটা নিয়ে আবার পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডজনখানেক নানা বয়সের বাচ্চা হাততালি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, আর নীলা কাঁপতে কাঁপতেই খিলখিল করে হেসে উঠল আনন্দে।

লঞ্চের রেলিংটা শক্ত করে ধরে রেখে ইশতিয়াক সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, "কী মনে হয় তোর আজমল? নীলা কি ডিপ্রেশান থেকে বের হয়ে আসছে?"

ডক্টর আজমল নিচু গলায় বললেন, "দেখ, ইশতিয়াক, আমি চাই না তোর পরে আশাভঙ্গ হোক—তা-ই কিছু বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু যদি নীলার মাঝে এই ভাবটা ধরে রাখা যায়—তা হলে মনে হয় একটা-কিছু হয়ে যাবে!"

"কতক্ষণ ধরে রাখতে হবে? কতক্ষণ?"

"বলা মুশকিল— যত বেশি সময় হয় ততই ভালো।"

"কিন্তু দেখছিস না শীতে কাঁপছে?"

"হ্যাঁ। এখন খানিকক্ষণের জন্যে উপরে নিয়ে আয়—শরীর মুছে আবার খানিকক্ষণ পরে না হয় খেলাতে দিস! পানিতে ভিজেই যে খেলাতে হবে তা নয়— অন্য কোনোভাবে।"

"এই যে বকুল মেয়েটাকে দেখছিস—নিশ্চয়ই জাদু জানে—নিশ্চয়ই জানে। কী বলিস তুই?"

ডক্টর আজমল হাসলেন, "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এরকম পাওয়া যায়। এক দুজন মানুষ—তাদের হাতের ছোঁয়ায় জাদু থাকে, চোখের দৃষ্টিতে জাদু—"

ইশতিয়াক সাহেব হঠাৎ আজমলের হাতটা চেপে ধরে প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, "কী মনে হয় তোর? বাঁচবে আমার মেয়েটা? বাঁচবে?"

ডক্টর আজমল ইশতিয়াক সাহেবের কাঁধ স্পর্শ করে বললেন, "এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? একটু ধৈর্য ধর। মনে হয় খোদা আমাদের কথা শুনেছেন।"

নীলা শরীর মুছতে মুছতে বলল, "আব্বু, এমন খিদে লেগেছে যে মনে হচ্ছে আস্ত একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব।"

তুচ্ছ একটা কথা শুনে ইশতিয়াক সাহেবের চোখে পানি এসে গেল, শেষবার কবে মেয়েটি শখ করে কিছু খেতে চেয়েছে? সাবধানে চোখের পানি গোপন করে বললেন, "এখন তোর জন্যে ঘোড়া রান্না করবে কে?"

কথাটি যেন সাংঘাতিক হাসির কথা নীলা সেরকমভাবে হাসতে শুরু করল। ইশতিয়াক সাহেব মনে করতে পারলেন না শেষবার কবে তাকে হাসতে শুনেছেন। হাত দিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, "কী খাবি মা?"

"ইলিশ মাছের ভাজা দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে আব্বু। ঝাল করে কাঁচা-মরিচ দিয়ে ভাজবে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"লঞ্চের কিচেনে তো কোনো ইলিশ মাছ নেই!"

"কী হয়েছে ইলিশ মাছের?"

"দেখলে না পুরো ইলিশ মাছটা খাইয়ে দিলাম টুশকিকে! যা পেটুক, তুমি বিশ্বাস করবে না! ইলিশ মাছ শেষ করে গলদা চিংড়ি, রুইমাছ—"

ইশতিয়াক সাহেব যখন নীলাকে নিয়ে লঞ্চে করে বেড়াতে আসেন তখন সাথে নানারকম খাবারের আয়োজন থাকে। লঞ্চের নিচে রান্না করার ব্যবস্থা রয়েছে, কখনো খাওয়ার সমস্যা হয় না। আজ অবিশ্যি ভিন্ন ব্যাপার, কিচেনের যাবতীয় খাবার টুশকি নামের শুশুকটিকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ইশতিয়াক সাহেব দরজা দিয়ে গলা বের করে ডাকলেন, "শমশের—"

শমশের প্রায় সাথে সাথেই নিঃশব্দে হাজির হয়ে বলল, "আমাকে ডেকেছেন স্যার?"

"কিচেনের সব ইলিশ নাকি টুশকিকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে।"

"জি স্যার।"

"কতক্ষণে তুমি কিছু ইলিশ মাছ আনতে পারবে?"

শমশের খানিকক্ষণ তার নখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন সেখানে কিছু-একটা তথ্য লেখা রয়েছে, তারপর মুখ তুলে বলল, "বিশ মিনিট স্যার।"

"তোমাকে পুরো তিরিশ মিনিট সময় দিচ্ছি। যাও।"

"ঠিক আছে স্যার।"

শমশের ঠিক যেরকম নিঃশব্দে হাজির হয়েছিল ঠিক সেরকম নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই শক্তিশালী স্পিডবোটের গর্জন শোনা গেল, শহর থেকে ডক্টর আজমলকে এক ঘন্টার মাঝে নিয়ে আসার রহস্যটা ইশতিয়াক সাহেবের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল হঠাৎ।

আধা ঘন্টার মাঝে সত্যি সত্যি ইলিশ মাছ হাজির হল, সেটা কেটেকুটে রান্না করতে করতে আরও আধাঘন্টা। খাওয়া শেষ হতে হতে আরও আধাঘন্টা। ইশতিয়াক সাহেব সবাইকে নিয়ে খেতে চাইছিলেন, কিন্তু বকুল এবং অন্য বাচ্চাগুলো কিছুতেই রাজি হল না।

ডক্টর আজমল নীলাকে পরীক্ষা করে খানিকক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন, সে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না, কিন্তু একরকম জোর করে শুইয়ে দেবার পর প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার দুর্বল শরীর কী পরিমাণ ক্লান্ত হয়েছিল সে নিজেও জানত না।

বিকেলবেলা বকুল এল একটা ছোট মোরগের বাচ্চা হাতে—নীলার জন্যে এই মোরগের বাচ্চাটি সদকা দেওয়া হবে। ইশতিয়াক সাহেব মোরগের বাচ্চাটির দাম দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু বকুল সজোরে মাথা নেড়ে বলল সাজ্জাদ জানিয়েছে যে নিজেদের মানুষেরা এর দাম দিয়ে দিলে সদকার কার্যক্ষমতা কমে যায়। ইশতিয়াক সাহেব সেটা শুনে আর দাম দেওয়ার চেষ্টা করলেন না, নীলাকে ডেকে দিয়ে একটু আড়ালে সরে গেলেন, দেখলেন অত্যন্ত গম্ভীরমুখে বকুল কিছু-একটা বলছে, নীলা খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনছে।

খানিকক্ষণ পর নীলা এসে ইশতিয়াক সাহেবকে বলল, "আব্বু—আমি বকুলের সাথে যাই?"

"কোথায় যাবি?"

"এই তো গ্রামে।"

যে-মেয়েটি আজ সকালেও রুগ্‌ণ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল সেই মেয়েটি যদি এখন আরেকজনকে নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে চায় সেটি খুব সহজভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। ডক্টর আজমল থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যেত, কিন্তু তাঁর হাসপাতালে ডিউটি ছিল বলে ঘণ্টাখানেক আগে চলে গিয়েছেন। নীলা আবার জিজ্ঞেস করল, "যাই বাবা?"

"ঠিক আছে, যা।"

সাথে সাথে নীলা গায়ে হালকা একটা সোয়েটার চাপিয়ে বকুলের সাথে রওনা দিল। দুজনে একটু দূরে সরে যেতেই ইশতিয়াক সাহেব চাপা গলায় ডাকলেন, "শমশের—"

শমশের নিঃশব্দে এসে বলল, "জি স্যার?"

"ঐ যে দেখছ নীলা আর বকুল? তাদের দুজনকে চোখে-চোখে রাখবে। কিন্তু খুব সাবধান, তারা যেন বুঝতে না পারে।"

"ঠিক আছে স্যার।"

শমশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন ইশতিয়াক সাহেব আবার ডাকলেন, "শমশের—"

"জি স্যার।"

"থাক দরকার নেই। আমার মেয়েটি কি বেঁচে যাবে কি না সেটা এখন নির্ভর করছে এই বাচ্চা মেয়েটার উপর।"

শমশের নিচু গলায় বলল, "আল্লাহ্ মেহেরবান।"

"ঐ মেয়েটাকে আমার বিশ্বাস করা উচিত। কী বল?"

"জি স্যার।"

৫

বকুল আর নীলা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। বকুলের ডান হাতে শক্ত করে ধরে রাখা মোরগের বাচ্চা, সেটা মনে হয় তার অবস্থাটাকে বেশ মেনে নিয়েছে, কোনো রকম আপত্তি করছে না। নীলা জিজ্ঞেস করল, "কাকে দেবে এই মোরগটা।"

"খেলার মাকে।"

"খেলার মা? একজন মানুষের নাম খেলা?"

"আসল নাম খেলারানী। এখন বিয়ে করে ইন্ডিয়া চলে গেছে। হিন্দু মানুষ তো তাই গ্রামের মাতব্বরেরা খুব অত্যাচার করে।"

"হিন্দুদের মাতবরেরা অত্যাচার করে নাকি?"

"করে না আবার! খেলার মাকেও ইন্ডিয়া নিতে চেয়েছিল, সে যায় নাই। বলেছে এইটা আমার দেশ এইটা আমার মাটি। আমি যাব না। সে আর যায় নাই। মুরগির সদকাটা তারেই দেই, ভাল হবে।"

নীলা মাথা নাড়ল। বকুল মোরগের বাচ্চাটা হাতবদল করে বলল, "তা ছাড়া হিন্দু মানুষ তো, তাকে দিলে অন্য লাভ হবে।"

"কী লাভ?"

"সদকা দেওয়াটা মুসলমানদের নিয়ম, আল্লাহ্ খুশি হবে। হিন্দুদের যদি দেওয়া হয় তা হলে ভগবানও খুশি হবে। একই সাথে আল্লাহ্ আর ভগবান দুজনকেই খুশি করা!"

নীলা ভুরু কুঁচকে বলল, "আল্লাহ্ আর ভগবান একই না?"

বকুল ঘাড় নেড়ে বলল, "জানি না। হলে তো আরও ভালো।"

দুইজন কথা না বলে চুপচাপ কিছুক্ষণ হেঁটে যায়। বকুল একসময় বলল, "তোমাদের ঢাকা শহরে কত কী দেখার আছে। আমাদের এখানে তো দেখার মতো কিছুই নাই। তোমাকে যে কী দেখাই! দেখার মতো জিনিস হচ্ছে গিয়ে জমিলা বুড়ি, মতি পাগলা আর বিশু-চোরা।"

"এরা কারা?"

"জমিলা বুড়ি হচ্ছে ডাইনি বুড়ি।"

নীলা চোখ কপালে তুলে বলল, "ডাইনি বুড়ি?"

"সবাই বলে। ছোট বাচ্চা দেখলে জাদু করে ব্যাঙ নাহলে ইঁদুর তৈরি করে ঝোলার মাঝে ভরে ফেলে!"

"ধুর!"

"ছয়টা নাকি তার পোষা জ্বীন আছে। সবসময় সে জ্বীনদের সাথে কথা বলে।"

"যাও!"

বকুল দাঁত বের করে বলল, "দেখ নাই তো তাই বলছ যাও। দেখলে দাঁতে দাঁত লেগে যাবে। ফিট হয়ে ধড়াম করে পড়বে মাটিতে।"

"কচু!"

"আমার কথা বিশ্বাস হল না?"

"উঁহু।"

বকুল মুখ শক্ত করে বলল, "চলো তা হলে জমিলা বুড়ির কাছে। যাবে?"

"চলো।"

"পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিও না।"

নীলা মাথা নেড়ে বলল, "দেব না।"

বকুল নীলাকে নিয়ে জমিলা বুড়ির বাসায় যেতে যেতে বলল, "জমিলা বুড়িকে না দেখে চলো মতি পাগলাকে নাহয় বিশু চোরাকে দেখতে যাই।"

"কেন?"

"ওদের দেখার মাঝে কোনো বিপদ নাই। মতি পাগলাকে সবসময় বেঁধে রাখে—কিছু করতে পারে না। আর বিশু-চোরা হচ্ছে বিখ্যাত চোর। চুরির যদি কোনো কম্পিটিশান থাকত তা হলে বিশু-চোরা গোল্ড মেডেল পেত!"

নীলা চোখ বড় বড় করে বকুলের গল্প শোনে। সে যেখানে থাকে তার আশে-পাশের মানুষজন এখানকার মানুষের তুলনায় মনে হয় নেহাত পানশে। মতি পাগলা এবং বিশু-চোরার বর্ণনা শুনে বলল, "আগে ডাইনি বুড়িকে দেখি, তার পরে মতি পাগলা আর বিশু চোরাকে দেখব।"

"ঠিক আছে।"

দুজনে গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। একসময় রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ এবং সবশেষে ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে হয়। গ্রামের একেবারে বাইরে কিছু ঝোপঝাড় বনজঙ্গল। তার পাশে একটা ছোট ঝুপড়িমতন। বকুল ফিসফিস করে বলল, "ঐ যে জমিলা বুড়ির বাড়ি।"

"জমিলা বুড়ি কই?"

"বাড়ির বাইরে মাটিতে বসে থাকে।"

"দেখি না তো!"

"মনে হয় ভিতরে আছে।"

"দেখব কেমন করে?"

"দাঁড়াও ডাকি। যদি বের হয়ে আসে দৌড় দিতে হবে কিন্তু।"

নীলা জোরে দৌড়াতে পারবে তার সেরকম বিশ্বাস নেই কিন্তু তবু সে না করল না। বকুল ঝুপড়ি মতন ঘরটার কাছে গিয়ে ডাকল, "জমিলা বুড়ি—ও জমিলা বুড়ি—"

নীলার বুক ধুকধুক করতে থাকে, মনে হয় এক্ষুনি বুঝি ঘরের ভিতর থেকে ভয়ংকর কিছু বের হয়ে আসবে, কিন্তু কিছুই বের হল না। বকুল আবার ডাকল, "জমিলা বুড়ি, ও জমিলা বুড়ি—"

এবারেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। বকুল মাথা নেড়ে বলল, "বাড়িতে নেই জমিলা বুড়ি।

নীলা বলল, "কিন্তু দরজা তো খোলা!"

বকুল দাঁত বের করে হেসে বলল, "জমিলা বুড়ির দরজা সবসময় খোলা থাকে, ছয়টা জ্বীন বাড়ি পাহারা দেয়, চোরের বাবারও সাহস নেই ভিতরে ঢোকার!"

নীলা বলল, "ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি?"

বকুল বলল "সর্বনাশ!"

নীলা কিন্তু সত্যি সত্যি ঘরের ভিতরে রওনা দিল। বকুলকে আর যা-ই বলা যাক ভীতু বলা যায় না, সেও নীলার পিছুপিছু এল।

ঘরের ভিতরে আবছা অন্ধকার এবং বোটকা একধরনের গন্ধ। কোন মানুষের ঘর যে এত আসবাবপত্রহীন সাদামাটা হতে পারে নীলা চিন্তাও করতে পারে না। ভিতরে এক পা ঢুকতেই চিৎকার করে পিছনে সরে আসে, ঘরের মেঝেতে একজন ডাইনি বুড়ি মরে পড়ে আছে। বকুল সাথে সাথে ছুটে এসে বলল, "কী হয়েছে?"

নীলা হাত দিয়ে দেখাতেই বকুল ফিসফিস করে বলল, "জমিলা বুড়ি!"

"মরে গেছে?"

"মনে হয়।" বকুল সাবধানে এগিয়ে গেল, তার ভয় হতে থাকে হঠাৎ বুঝি জমিলা বুড়ি দাঁত এবং নখ বের করে চিৎকার করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাছে গিয়ে সে দেখল খুব ধীরে ধীরে এখনও নিশ্বাস পড়ছে, এখনও বেঁচে আছে জমিলা বুড়ি। বকুল কী করবে বুঝতে পারল না, দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জমিলা বুড়ি অসুস্থ— মনে হয় বাড়াবাড়ি অসুস্থ। সে সাবধানে হাত দিয়ে জমিলা বুড়িকে ছুঁয়ে দেখল, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। মাথা নেড়ে বলল, "অনেক জ্বর।"

নীলা বলল, "ডাক্তার ডাকতে হবে।"

"ডাক্তার কোথায় পাব? এখানে কোন ডাক্তার নাই।"

"তা হলে?"

"মাথায় পানি দিতে হবে।"

"মাথায় পানি?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে দেবে?"

"দেখি।"

বকুল বাইরে গিয়ে মোরগের বাচ্চাটকে ঘরের বারান্দার একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। তারপর খুঁজেপেতে একটা মাটির হাঁড়ি বের করে পানি আনতে গেল। পাশেই একটা এঁদো ডোবা রয়েছে, সেখান থেকে পানি নিয়ে আসে। ঘরের ভিতরে মাথায় পানি দেওয়া মুশকিল বলে বকুল আর নীলা দুজনে মিলে জমিলা বুড়িকে টেনে বারান্দায় নিয়ে এসে মাথায় পানি ঢালতে থাকে। মিনিট দশেক পর জমিলা বুড়ি ধীরে ধীরে নড়তে তাকে—মনে হয় জ্বর কমছে। একসময় চোখ খুলে তাকাল, ঘোলা দৃষ্টি। দেখে বকুলের বুকের ভিতর কেমন যেন কাঁপতে থাকে। জমিলা বুড়ি ফিসফিস করে বলল, "পানি।"

নীলা সাবধানে জমিলা বুড়ির মুখের মাঝে একটু পানি ঢেলে দেয়। জমিলা বুড়ি জিব বের করে পানিটা চেটে খেয়ে হঠাৎ ফোকলা মুখে হেসে ফিসফিস করে বলল, "তুমি কি পরী?"

নীলা মাথা নাড়ল, বলল, "না, আমার নাম নীলা।"

"নীল পরী! উড়তে পার?"

নীলা অবাক হয়ে বকুলের দিকে তাকাল, বকুল ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে ভাবছে পরী!"

জমিলা বুড়ি তার শীর্ণ হাত বের করে নীলার মুখ স্পর্শ করে বলল, "বেঁচে থাকো বোনটি। শকুনের সমান পরমায়ু হোক।"

বকুলের চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল, নীলার কাঁধ খামচে ধরে বলল, "শুনেছ? শুনেছ?"

"কী?"

"তোমার আর ভয় নেই! অসুখ ভালো হয়ে যাবে তোমার।"

"কেন?"

"শুনলে না জমিলা বুড়ি বলছে, শকুনের সমান পরমায়ু হোক। জমিলা বুড়ির কথা মিছা হয় না! কখনো মিছা হয় না!"

নীলা অবাক হয়ে বকুলের দিকে তাকিয়ে রইল।

খেলার মাঠে মোরগের বাচ্চা দিয়ে ফিরে আসতে আসতে নীলা আর বকুলের সন্ধে পার হয়ে গেল। লঞ্চের বাইরে ইশতিয়াক সাহেব খুব অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন, বকুলের সাথে নীলাকে দেখে তাঁর শরীরে যেন প্রাণ ফিরে এল। নিজের অস্থিরতাকে গোপন করে নরম গলায় বললেন, "কীরে মা! কেমন হল বেড়ানো।"

"আব্বু তুমি বিশ্বাস করবে না কী হয়েছে!"

"কী হয়েছে?"

"একজন ডাইনি বুড়ি আছে তার নাম জমিলা বুড়ি। তার খুব অসুখ।"

"ডাইনি বুড়ির অসুখ হয় নাকি?"

"মনে হয় সত্যিকার ডাইনি বুড়ি না। ভেজাল।"

"তাই হবে। অসুখটাও কি ভেজাল?"

"না আব্বু, অসুখটা ভেজাল না। ভীষণ জ্বর। আমি আর বকুল মাথায় পানি দিয়ে জ্বর কমিয়েছি।"

ইশতিয়াক সাহেব স্থিরচোখে তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যে- মেয়েটি একদিন আগেও নিজেই অসুস্থ দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল সে এখন অন্য মানুষের অসুখের সেবা করছে?

"আব্বু— একজন ডাক্তার দরকার। এখানে কোনো ডাক্তার নেই।"

"নেই নাকি?"

"না আব্বু।"

"ঠিক আছে।" ইশতিয়াক সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, "শমশের—"

সাথে সাথে নিঃশব্দে শমশের এসে হাজির হল। বলল, "আমাকে ডেকেছেন স্যার?"

"হ্যাঁ। আমাদের একজন ডাক্তার দরকার।"

শমশের উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "কার জন্যে স্যার?"

"একজন ভেজাল ডাইনি বুড়ির নাকি খাঁটি জ্বর উঠেছে, তার জন্যে। কতক্ষণ লাগবে?"

শমশের তার হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আধাঘন্টার মতো লাগবে স্যার।"

"তোমাকে আধাঘন্টা নয়, পুরো একঘন্টা সময় দিলাম। যাও নিয়ে এসো একজন।"

শমশের হেঁটে চলে যাচ্ছিল তখন নীলা পিছন থেকে ডাকল, "শমশের চাচা!"

শমশের ঘুরে তাকাল। নীলা বলল, "আব্বুর কথা শুনবেন না। আপনি আধাঘন্টার মাঝেই নিয়ে আসেন। অসুখ খুব খারাপ জিনিস! আমি জানি।"

শমশের হাসিমুখে বলল, "ঠিক আছে! আমি আধাঘন্টার মাঝেই আনব।"

৬

প্রিয় বকুল,

তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি। মানুষ চিঠিতে সবসময় লেখে তুমি কেমন আছ আমি ভালো আছি— আমি আগে কোনদিন লিখিনি কারণ আগে আমি কখনো ভাল ছিলাম না। সবসময় আমার অসুখ ছিল। আজমল চাচা বলেছেন আমি এখন ভালো হয়ে গেছি সেজন্যে লিখলাম। হা হা হা।

আমি আসলেই ভালো হয়ে গেছি। তোমার জন্যে আসলে আমার অসুখ ভালো হয়েছে। এখন আমার সবসময় খিদে থাকে আর আমি সবসময় খাই। আমাকে দেখে আগে যেরকম কাঠির মতো লাগত এখন সেরকম লাগে না। আমি এখন মোটাসোটা হয়েছি। মনে হচ্ছে কয়েকদিনের মাঝে আমি মোটা হতে হতে একেবারে গোলআলুর মতো হয়ে যাব, কেউ ধাক্কা দিলেই তখন বলের মতো গড়াতে থাকব। সব দোষ হবে তোমার। হা হা হা।

বকুল, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ কাজেই এখন তোমাকে আমার প্রাণের বন্ধু হতেই হবে। প্রাণের বন্ধু আর জীবনের বন্ধু। তুমি আমাকে চিঠি লিখে জানাও তোমার প্রাণের বন্ধু আর জীবনের বন্ধু হতে কোন আপত্তি আছে কি না।

ইতি তোমার প্রাণের বন্ধু নীলা।

পুনঃ টুশকি কেমন আছে? তাকে আমার হয়ে একটু রগড়া দিও।

পুনঃ পুনঃ জমিলা বুড়ি কেমন আছে? তাকে কি এখনো তোমরা ভয় পাও?

পুনঃ পুনঃ পুনঃ খেলার মা এবং মতি পাগলা এবং বিশু-চোরা কেমন আছে?

প্রিয় নীলা,

আমি তোমার চিঠি সময়মতোই পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে দেরি হল কারণ চিঠি পোস্ট করার জন্যে কোন থাম ছিল না—পোস্টঅফিস অনেক দূরে, আনতে দেরি হয়েছে।

তুমি লিখেছ আমি তোমার জীবন বাঁচিয়েছি কিন্তু আমি তো কিছুই করি নাই, আমি কেমন করে জীবন বাঁচালাম? মনে হয় মোরগ সদকা দেওয়াটাতে কাজ হয়েছে। তোমার জান না নিয়ে মোরগের বাচ্চার জান নিয়েছে। আমার তাই মনে হয়।

আমি তোমার জান না বাঁচালেও আমি তোমার প্রাণের বন্ধু হতে রাজি আছি। আমার কোনই আপত্তি নাই। সারাজীবনের জন্যে প্রাণের বন্ধু কীভাবে হতে হয়? কোন কি নিয়ম আছে?

ইতি তোমার প্রাণের এবং জীবনের বন্ধু বকুল।

পুনঃ জমিলা বুড়ি ভালোই আছে, এখন তাকে দেখলে বেশি ভয় লাগে না। মতি পাগলা সেদিন ছুটে গিয়েছিল, দা হাতে নিয়ে সাফ দিচ্ছিল তখন সবাই মিলে তাকে ধরে ফেলেছে। বিশু-চোরা ভালোই আছে, মনে হয় তার চুরি ভালোই হচ্ছে।

পুনঃ পুনঃ টুশকির সাথে প্রায় প্রত্যেকদিনই দেখা হয়। গ্রামের লোকজন এখন আর টুশকিকে দেখে ভয় পায় না। আমি সেদিন টুশকির পিঠে উঠেছিলাম, সে আমাকে নিয়ে নদীর মাঝখানে গিয়েছিল, তবে তার বুদ্ধি খুব কম। নদীর মাঝখানে গিয়ে আমাকে নিয়ে পানির নিচে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। হা হা হা।

প্রিয় বকুল,

তোমার যেন চিঠি লিখতে দেরি না হয় সেজন্যে অনেকগুলো স্ট্যাম্প পাঠালাম। এখন আর তোমার পোস্টঅফিস যেতে হবে না। প্রাণের বন্ধু এবং জীবনের বন্ধু হওয়ার প্রথম নিয়ম চিঠি পেলে সাথে সাথে উত্তর দিতে হয়।

টুশকির পিঠে চড়ে তুমি নদীর মাঝখানে গিয়েছিলে শুনে আমি হিংসায় চোটে প্রায় মারা যাচ্ছি। আমাকে ছাড়া তুমি একলা টুশকির পিঠে চড়বে না। না না না। তবে আমার আব্বু বলেছে যতদিন আমি সাঁতার না শিখব ততদিন আমাকে টুশকির পিঠে নদীর মাঝে যেতে দেবে না। আমি আব্বুকে বলেছি আমাকে এক্ষুনি সাঁতার শিখিয়ে দিতে। আব্বু বলেছে শমশের চাচাকে। শমশের চাচা বলেছে এক দুই সপ্তাহের আগে নাকি সাঁতার শেখা যাবে না। ই ই ই ই (এটা মানে রাগ)।

আব্বু বলেছে আমাকে একবার নিউ ইয়র্কে নিয়ে ডাক্তার দেখাবে। এই শেষবার। আর যেতে হবে না। মনে হয় সামনের সপ্তাহে যেতে হবে। তুমি কিন্তু চিঠি লিখে যাবে। শমশের চাচাকে বলে দেওয়া আছে, শমশের চাচা তোমার চিঠি আব্বুর নিউ ইয়র্ক অফিস, না হলে হোটেলে ফ্যাক্স করে দেবে।

তাড়াতাড়ি চিঠি লিখবে।

তোমার প্রিয় বন্ধু প্রাণের বন্ধু এবং সারাজীবনের বন্ধু নীলা।

প্রিয় নীলা,

একটা অনেক গরম খবর আছে। সেইদিন স্কুল থেকে আসছি তখন বিশু চোরার সাথে দেখা। তাকে দেখে প্রথম চিনতে পারি নাই কারণ তার মাথার সব চুল এমনকি ভুরু পর্যন্ত কামানো। তা ছাড়া কপালে এবং মুখে আলকাতরার দাগ। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে, প্রথমে স্বীকার করতে চায় না, অনেক জোরাজুরি করার পরে বলল, সে নাকি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, তখন গ্রামের লোক তার চুল

এবং ভুরু কামিয়ে দিয়ে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। সে ন্যাংড়াতে ন্যাংড়াতে হাঁটছিল, মনে হয় তাকে ধরে কিছু পিটুনিও দিয়েছে।
তুমি নিউ ইয়র্কে যাবে শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি বইয়ে পড়েছি সেখানে অনেক ঠাণ্ডা। তুমি ভালো করে সোয়েটার পরে ঘর থেকে বের হবে।
তোমার সাঁতার শেখার কী অবস্থা ? আমার কাছে এলে আমি তোমাকে একদিনে সাঁতার শিখিয়ে দেব। (গাছে উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেব, তুমি হাবুডুবু খেয়ে একবারে সাঁতার শিখে যাবে। হা হা হা।)

ইতি প্রাণের বন্ধু জীবনের বন্ধু বকুল।

পুনঃ টুশকির বুদ্ধি মনে হয় একটু বেড়েছে। আমাকে নিয়ে সে যখন নদীর ভিতরে ঢুকে যেতে চায় আমি তখন তার পিঠে থাবা দেই, তা হলে আবার সে ভেসে ওঠে। আমি আজকে টুশকির পিঠে করে অনেকক্ষণ নদীতে সাঁতার কেটেছি। আমার মা-বাবা এবং বড়চাচার ধারণা এই কাজটা খুব খারাপ। মেয়েদের নাকি ঘরের ভিতরের কাজ শেখা উচিত। রান্নাবান্না করা, বাসন এবং কাপড় ধোয়া এবং সেলাইয়ের কাজ। ই- ই- ই- ই-ই।

প্রিয় বকুল,
তুমি ঠিকই বলেছ, নিউ ইয়র্কে অনেক ঠাণ্ডা। শুধু সোয়েটার পরলে হয় না, তার উপর একটা জ্যাকেট পরতে হয়। আজকে আমার আব্বু বলেছে ডাক্তারদের ধারণা আমার বিপদ কেটে গেছে। বলেছে সবসময় হাসিখুশি থাকতে। হা হা হা হি হি হি হো হো হো (হাসিখুশি থাকছি!)
আমার সাঁতার শেখা এখনও শুরু হয়নি। নিউ ইয়র্কে বেশিদিন থাকলে এখানে আব্বু সাঁতার শেখার স্কুলে ভর্তি করে দেবে। কিন্তু এখানে আমার একেবারে ভালো লাগে না। তবে দোকানগুলো অনেক সুন্দর। আমি তোমার জন্যে একটা গিফট কিনেছি, সেটা দেখলে তোমার চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। হা হা হা।
টুশকির বুদ্ধি একটু বেড়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমাকে নিয়ে যদি পানির নিচে ডাইভ দেয় কী বিপদ হবে জান ? তবে প্লিজ প্লিজ প্লিজ তুমি একা একা সব মজা শেষ করে ফেলো না। প্লিজ প্লিজ প্লিজ।

প্রাণের বন্ধু জীবনের বন্ধু পৃথিবীর অন্য পাশ থেকে নীলা।

পুনঃ বিশু চোরার ভুরুর চুল কি গজিয়েছে ? আমি শুনেছিলাম ভুরু একবার কামানো হলে সেটা নাকি আর গজায় না। তুমি অবশ্য অবশ্য আমাকে জানাও।

প্রিয় নীলা,
আমি বিশু চোরার সাথে কথা বলেছি। সে বলেছে ভুরু কামালে আবার নাকি ভুরু গজায়, তবে অনেকদিন সময় লাগে। বিশু চোরার ভুরু নাকি আগেও একবার কামানো হয়েছিল।
নিউ ইয়র্কের ডাক্তার বলেছে তোমার বিপদ কেটেছে শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম কারণ এদিকে একটা সাংঘাতিক বড় গোলমাল হয়েছে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক বড় গোলমাল। তুমি শুনলে ভয়ে তোমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তোমার মনে আছে সাজ্জাদ বলেছিল কারও জান বাঁচানোর জন্যে আরেকটি জান দিতে হয়? সেইজন্যে আমরা মোরগের বাচ্চাটা সদকা দিয়েছিলাম খেলার মাকে? তোমার মনে আছে আমরা খেলার মাকে বলেছিলাম সে যেন অবশ্য অবশ্যই সেটা জবাই করে খেয়ে ফেলে?

তুমি বিশ্বাস করবে না খেলার মা কি করেছে! সে মোরগের বাচ্চাটা জবাই করে নাই। শুধু তাই না, সেটাকে সে খাইয়ে দাইয়ে এই মোটা করেছে। তুমি চিন্তা করতে পার ? জানের বদলে জান দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা দেওয়া হয় নাই। আমি অনেক রাগ হয়েছিলাম, তখন খেলার মাও আমার উপর অনেক রাগ হয়েছে। সে নাকি মোরগ খায় না। শুধু মোরগ না, মাছ মাংস ডিম কিছুই খায় না। চিন্তা করতে পার ?
টুশকির খবর ভালো। আমি তাকে এখন পানির মাঝে লাফ দেওয়া শিখাচ্ছি। প্রথমে আমাকে নিয়ে সে পানির নিচে চলে যায়, আমি তার পিঠ আঁকড়ে বসে পা দিয়ে পেটের মাঝে গুঁতো দিতেই সে পানি থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে আসে। কী যে মজা হয় তুমি চিন্তাও করতে পারবে না!

তোমার প্রাণের বন্ধু বকুল।

প্রিয় বকুল,
আমাকে নিয়ে আব্বু ওয়াশিংটন ডি.সি. গিয়েছিল, সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর মিউজিয়াম দেখেছি। এসেই তোমার চিঠি পেয়েছি, আমার একটা অনেক বড় চিঠি লেখার ইচ্ছে করছে কিন্তু সেটা লিখতে পারব না কারণ আব্বু আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে নিয়ে ব্রডওয়েতে একটা থিয়েটার দেখতে যাবে। থিয়েটার দেখে এসে আমি তোমাকে চিঠি লিখব।

প্রাণের বন্ধু জীবনের বন্ধু নীলা।

পুনঃ আব্বু আমাকে নিয়ে ফ্লোরিডা যাচ্ছে বলে এখন তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারছি না। ই-ই-ই-ই—
পুনঃ পুনঃ টুশকির খবর পড়ে আমার হিংসা বেড়েই যাচ্ছে।

প্রিয় নীলা,
টুশকির একটা বড় খবর আছে। এতদিন টুশকির যখন ইচ্ছা হত তখন সে আমার কাছে আসত। নদীতে যখন লাফঝাঁপ দিতাম তখন সে শব্দ হলে চলে আসত। গত কয়েকদিন হল টুশকিকে ডাকার একটা উপায় বের করেছি। নদীর পাড়ের হিজল গাছটার কথা মনে আছে ? সেটা আরও বাঁকা হয়েছে, একটা ডাল পানিতে লেগে আছে। সেই ডালে উঠে লাফালে পানিতে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনে টুশকি চলে আসে। কী মজা! যখন ইচ্ছা তখন তাকে ডাকতে পারি। অনেকটা টেলিফোন করার মতো । টুশকির কাছে টেলিফোন। হা হা হা।
টুশকির খবর মনে হয় আশেপাশে ছড়িয়ে গেছে কারণ আমি দেখেছি অনেক দূর দূর থেকে লোকেরা টুশকিকে দেখতে আসে। সেদিন খবরের কাগজ থেকে লোক এসেছিল কিন্তু আমার বাবা বলেছে মেয়েদের খবরের কাগজের লোকের সাথে বলা ঠিক না। তুমি চিন্তা করতে পার? ই- ই- ই-ই—
ফ্লোরিডাতে কী দেখলে আমাকে লিখে জানিও।

প্রাণের বন্ধু জীবনের বন্ধু বকুল।

প্রিয় বকুল
তোমার বাবা খবরের কাগজের লোকের সাথে কথা বলতে দেননি শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছে, দেওয়া উচিত ছিল। তবে দিলে আমার হিংসা আরও অনেক বেশি হত—এত বেশি হত যে আমি মনে হয় ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেতাম। এক দিক দিয়ে ভালোই হল। হা হা হা হা।

ফ্লোরিডায় আমি কিদেখেছি তুমি চিন্তাও করতে পারবে না! একটা জায়গা আছে সেটার নাম হচ্ছে সী-ওয়ার্ল্ড। সেখানে পানির মাঝে থাকে ডলফিন ঠিক টুশকির মতো। সেই ডলফিন যে কী মজার খেলা দেখায় চিন্তা করতে পারবে না। আমি আব্বুকে বলেছি দেশে এরকম একটা পার্ক খুলতে সেখানে টুশকি খেলা দেখাবে। কী মজা হবে না?

আব্বু আমাকে এখনই কেনেডি স্পেস সেন্টারে নিয়ে যাবে বলে চিঠি আর বড় করতে পারলাম না। দেশে ফিরে আসার জন্যে জীবন বের হয়ে যাচ্ছে।

ইতি প্রাণের বন্ধু নীলা।

পুনঃ আর কয়েকদিনের মাঝেই আমরা দেশে চলে আসব। হা হা হা।

৭

বকুল হিজল গাছটার মাঝামাঝি পা ঝুলিয়ে বসে বাইনোকুলার দিয়ে দেখছে। বাইনোকুলারের মতো মজার জিনিস পৃথিবীতে কি আর একটাও আছে? একজনকে এত কাছে থেকে দেখা যায় মনে হয় হাত দিয়ে ছোঁয়াও যাবে অথচ সেই মানুষটা জানেও না যে তাকে কেউ দেখছে! বকুল বেশ অনেকক্ষণ থেকে বাইনোকুলারে স্পিডবোটটাতে বসে থাকা দুজন মানুষকে দেখছে। একজন বিদেশী, এত বড় মানুষ অথচ একটা হাফপ্যান্ট পরে বসে আছে, অন্যজন দেশী মানুষ। বিশাল গর্জন করে পানি কেটে স্পিডবোটটা এসেছে, এখন ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিয়ে সেটা পানির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখা যায় মানুষগুলো কথা বলছে কিন্তু সেই কথা শোনা যায় না। বাইনোকুলার দিয়ে যেরকম দূরের জিনিস দেখা যায় সেরকম দূরের মানুষের কথা শোনার এরকম কি কোনো যন্ত্র আছে?

মানুষ দুজন হাত দিয়ে পানির দিকে দেখল তারপর তাদের গ্রামের দিকে তাকাল, কিছু-একটা যন্ত্রের মতো জিনিস পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে অন্য একটা যন্ত্রের মতো জিনিসের দিকে তাকিয়ে রইল। এই স্পিডবোটটা গত কয়েকদিন হল বেশ ঘনঘন আসছে এখানে, এসে নদীর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন করে। আগে বকুল বুঝতে পারত না কী করছে বাইনোকুলারটা পাওয়ার পর সে দেখতে পারে কী করছে কিন্তু এখনও কিছু বুঝতে পারছে না!

বাইনোকুলারটা তার জন্যে এনেছে নীলা। শুধু বাইনোকুলার না, জামাকাপড় জুতো, সোয়েটার, বই, ক্যালকুলেটর, ক্যামেরা কিছু বাকি রাখেনি। মনে হয় আস্ত একটা দোকান তুলে এনেছে। আরও অনেক জিনিস এনেছে যার নাম পর্যন্ত সে জানে না। পানির নিচে সাঁতার কাটার জন্যে একরকম চশমা, সাথে একটা ছোট নল যেন পানিতে ডুবে ডুবে নিশ্বাস নেওয়া যায়। ব্যাঙের পায়ের মতো বড় বড় পা, পায়ে লাগিয়ে সাঁতার কাটা ভারি সুবিধে। পাউডার, ক্রিম, লোশন, শ্যাম্পু এনেছে প্রায় এক বাক্স। গ্রামের সব মেয়েকে দিয়েও মনে হচ্ছে শেষ হবে না। জামাকাপড়গুলো এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না, কিন্তু মুশকিল হল যে সে এই কাপড়গুলি কোথায় পরবে বুঝতে পারছে না। ঈদের দিনে কিংবা কারও বিয়ে হলে পরা যায়। বকুলদের বাসায় যেদিন বেড়াতে যাবে সেইদিনও পরতে পারে। তবে ছেলেদের মতো প্যান্ট আর ঢলঢলে টি-শার্টগুলি সে মনে হয় কোনদিনও পরতে পারবে না, কোনো ছেলেকেই দিয়ে দিতে হবে। শহরের মেয়েরা মনে হয় শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরতে পারে, সে কীভাবে পারবে?

যেদিন নীলা এসেছিল সেদিন বকুল আর নীলা সারাদিন একসাথে কাটিয়েছে। সকালবেলা গল্পগুজব, দুপুরবেলা পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি—টুশকির সাথে খেলাধুলা, বিকেলে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো। কথা বলে বলে যেন আর শেষ হয় না। যে-কথাটি অনেকদিন থেকে কাউকে বলবে বলবে করে নীলা কখনো কাউকে বলতে পারেনি সেগুলো বকুলকে বলেছে। দীর্ঘ সময় নিয়ে বকুলকে তার মার কথা বলেছে। বলতে বলতে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলেছে। বকুল তখন তাকে শক্ত করে ধরে রেখে নিজেও ভেউভেউ করে কেঁদেছে। দুইজন একজন আরেকজনকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের মাঠের নির্জন রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছে। বকুল তার ওড়না দিয়ে নিজের চোখ মুছে নীলার চোখ মুছে দিয়েছে। সান্ত্বনার কথা বলেছে।

ইশতিয়াক সাহেব শমশেরকে নিয়ে গ্রামের মাতব্বরদের সাথে কথা বলেছেন। যে-গ্রামটির জন্যে তাঁর মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন সেই গ্রামের জন্যে কিছু-একটা করতে চান। আপাতত শুরু করবেন একটা স্কুল দিয়ে। স্কুলটা কোথায় হবে, জায়গাজমি কীভাবে জোগাড় করা হবে সেটা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখেছেন।

সন্ধেবেলা নীলা তাদের রাজহাঁসের মতো লঞ্চটাতে করে চলে গেছে। কয়েকদিনের মাঝে বকুলকে নীলাদের বাসায় বেড়াতে যেতে হবে। বকুল একেবারে গ্রামের মেয়ে, গ্রামের পথঘাটে নদীতে ঘুরে বেড়াতে তার কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু নীলাদের বাসায় গিয়ে সে কী করবে বুঝতে পারছে না। সে কখনো কোন বড়লোকদের বাসায় যায়নি, শুনেছে তাদের বাথরুমগুলোই নাকি তৈরি হয় সাদা পাথরের। বিছানা নাকি হয় নরম, ঘরে ঘরে থাকে এয়ারকন্ডিশন, গরমের সময় ঘরটা হয় নদীর পানির মতো ঠাণ্ডা, শীতের সময় হয় কুসুম-কুসুম গরম। বকুল অবিশ্যি নীলাদের বাসায় যাওয়া নিয়ে মোটেও চিন্তার মাঝে নেই, নীলা হচ্ছে তার প্রাণের বন্ধু আর জীবনের বন্ধু, যার অর্থ হচ্ছে দুজন মিলে একজন মানুষ। কাজেই নীলা তাকে সব শিখিয়ে দিতে পারবে—সেও যেরকম নীলাকে গ্রামের জিনিসপত্র শিখিয়েছে, সাঁতার শেখাচ্ছে।

বকুল চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে আবার নদীর মাঝে তাকাল, নৌকায় মানুষ দাঁড় টানছে, একজন মালবোঝাই একটা নৌকাকে লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বকুল মানুষটার মুখের দিকে তাকাল, বুড়োমতো একজন মানুষ মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শরীরটা পাথরের মতো শক্ত। মানুষটা লগি ঠেলতে ঠেলতে দাঁড়িয়ে গেল তারপর আকাশের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে পিছনে হাল-ধরে-থাকা মানুষটাকে কিছু-একটা বলল, তখন সেও আকাশের দিকে তাকাল। দুজনেই অকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বকুল বাইনোকুলারটি নামিয়ে রেখে আকাশের দিকে তাকাল, এক কোনায় একটা কালো মেঘ। বকুল মেঘটার দিকে ভালো করে তাকাল, এটার নিশানা ভালো নয়। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মাঝেই একটা বড় ঝড় আসবে। বকুল আকাশের মেঘটার দিকে তাকিয়ে রইল, নিরীহ ছোট একটা মেঘ, কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই নিশ্চয়ই সমস্ত আকাশ ছেয়ে যাবে। নদীতে নৌকাগুলোর মাঝে একটা ব্যস্ততার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সবগুলোই ঝড় শুরু হওয়ার আগে মনে হয় তীরে চলে আসতে চাইছে। বিদেশী সাহেবকে নিয়ে যে স্পিডবোটটা ছিল সেটাকে এখন দেখা যাচ্ছে না, চলে গিয়েছে কি না কে জানে!

বকুল হিজল গাছটা থেকে নেমে এল। ঝড় শুরু হলে মানুষজন খুব আতঙ্কিত হয়ে যায়, কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই ঝড় দেখতে বকুলের অসম্ভব ভালো লাগে। যখন আকাশ কালো করে মেঘ হয়ে সেটা জীবন্ত প্রাণীর মতো আকাশে পাক খেতে

থাকে—বিজলি চমকে চমকে উঠে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয়, প্রথমে দমকা হাওয়া তারপর প্রচণ্ড বাতাসে চারদিক থরথর করে কাঁপতে থাকে তখন বকুলের ইচ্ছে করে দুই হাত উপরে তুলে আনন্দে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেড়ায়।

বকুল আবার আকাশের দিকে তাকাল, ছোট মেঘটা দেখতে দেখতে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে, আকাশের একটা অংশ এর মাঝে অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। মেঘের মাঝখানে বিদ্যুতের ঝলকানি শুরু হয়ে গেছে। বকুল হিজল গাছ থেকে নেমে এল, বায়নোকুলারটা বাড়িতে রেখে আসতে হবে, ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে গেলে এত সুন্দর জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে। একবার ঝড় শুরু হয়ে গেলে মা বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না, তাই আগে থেকেই বের হয়ে যেতে হবে। ঝড়ের মাঝে ছুটে বেড়াতে কী মজাই-না লাগে!

বকুল বাড়িতে বাইনোকুলার রেখে আবার যখন নদীর তীরে এসে হাজির হল তখন আকাশের অর্ধেক মেঘে ঢেকে গেছে, একটু আগে দিনটা ছিল আলো- ঝলমল, এখন কেমন যেন অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। চারিদিকে থমথমে একটা ভাব, এতটুকু বাতাস নেই। নদীর পানিতে কেমন যেন কালচে একটা রং চলে এসেছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরে আঘাত করছে। বকুল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে, একটু আগেও কতগুলো নৌকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, এখন চারিদিক ফাঁকা। আকাশে কিছু পাখি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মনে হয় পাখিগুলো মানুষ থেকেও আগে বুঝতে পারে কিছু-একটা হতে যাচ্ছে।

বকুল নদীর তীরে হাঁটতে থাকে, অন্যদিন হলে আরও কিছু বাচ্চাকাচ্চা জুটে যেত কিন্তু আজকে কেন জানি কেউ নেই। বকুল আবার আকাশের দিকে তাকাল, মেঘটা এখন পুরো আকাশকে ঢেকে ফেলেছে, আর কী ঘন কালো মেঘ, মনে হয় যেন কুচকুচে কালো ধোঁয়া। মেঘটা থেমে নেই, জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়ছে, ঘুরপাক খাচ্ছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে। মেঘের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি উঁকি দিচ্ছে, কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। বকুলের ভিতরে কেমন জানি একধরনের উত্তেজনার ভাব হয়—ভয়ের একটা ব্যাপারে তার কেন এরকম আনন্দ আর উত্তেজনা হয় কে জানে!

নদীর পানিতে ঢেউটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, কালো পানিতে একটা থমথমে ভাব, হঠাৎ হঠাৎ এসে তীরে আঘাত করছে। বকুল হিজল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল এবং হঠাৎ করে বাতাসের একটা ঝাপটা অনুভব করল। ইতস্তত দমকা হাওয়া শুকনো পাতা ধুলোবালি খড়কুটো উড়তে থাকে। পশুপাখির চিৎকার শোনো যায়— চারিদিকে একটা ছুটোছুটি এবং তার মাঝে হঠাৎ কড়াৎ শব্দ করে খুব কাছে যেন বাজ পড়ল। সাথে বিদ্যুতের ঝলকানিতে চারিদিক আলো হয়ে ওঠে। দমকা বাতাসের বেগ বাড়ছে, শোঁশোঁ আওয়াজ হতে থাকে এবং হঠাৎ আবার বিদ্যুৎ ঝলকানির সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দ করে খুব কাছাকাছি কোথাও আরও একটা বজ্রপাত হল। ফোঁটা ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, প্রথমে ছাড়াছাড়াভাবে একটু পরে একটানা। বৃষ্টির ঝাপটায় বকুল এক নিমিষে ভিজে চুপসে গেল। কী ভালোই না লাগে তার বৃষ্টিতে ভিজতে!

বাতাসের বেগ বাড়ছে তার সাথে বৃষ্টি। এমনিতে বৃষ্টির ফোঁটার মাঝে কোমল আদর করার একটা ভাব আছে কিন্তু ঝড়ের সময় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো হয় রাগী আর তেজি। শরীরের মাঝে এসে বেঁধে তীরের মতো । বকুল বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নদীর তীরে হাঁটতে থাকে, বাতাস মনে হয় তাকে উড়িয়ে নেবে কিন্তু সে পরোয়া করে না। দুই হাত উপরের দিকে তুলে চিৎকার করে বলে, "জোরে! আরও জোরে!"

আরও জোরে ঝড় আসে, বিদ্যুতের ঝলকানির সাথে সাথে প্রচণ্ড শব্দ করে বজ্রপাত হচ্ছে, আকাশ চিরে আলোর ঝলকানি নেমে আসছে নিচে। নদীর কালো পানি প্রচণ্ড আক্রোশে যেন ফুঁসে উঠছে, ভেঙেচুরে যেন ধ্বংস করে দেবে চারিদিক।

বকুল নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঝড়ের শব্দ শুনতে থাকে, হঠাৎ করে সে ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে আরও একটা শব্দ শুনল—স্পিডবোটের ইঞ্জিনের শব্দ। শব্দটি একটানা নয়, ছাড়াছাড়া— মনে হচ্ছে নদীর ঢেউ আর ঝড়ের সাথে যুদ্ধ করতে করতে স্পিডবোটটা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এই প্রচণ্ড ঝড়ে পুরোপুরি মাথা-খারাপ না হলে কেউ নদীতে স্পিডবোট চালানোর চেষ্টা করে? বিদেশী সাহেবটা নিশ্চয়ই এই দেশের কালবোশেখির কথা শোনেনি! বুঝতেই পারেনি এত তাড়াতাড়ি এত বড় ঝড় শুরু হতে পারে।

বকুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে স্পিডবোটটা দেখার চেষ্টা করল, ঝড়, বৃষ্টি, ফুলে ওঠা ঢেউয়ের জন্যে কিছুই দেখা গেল না। আকাশ কালো হয়ে আছে। বৃষ্টির ছাটে চোখ খুলে রাখা যায় না। আবার আকাশ চিরে একটা বিদ্যুতের ঝলকানি নিচে নেমে এল আর সেই আলোতে বকুল দেখতে পেল নদীর মাঝামাঝি স্পিডবোটটা প্রচণ্ড ঢেউয়ে ওলটপালট করছে। ভিতর মানুষ আছে কি নেই সেটাও বোঝা যাচ্ছে না।

স্পিডবোটের ইঞ্জিনটা আবার একবার শব্দ করল, তারপর আবার ক্ষীণ হয়ে প্রায় থেমে গেল। একটু পরে আবার একটু গর্জন করে উঠল, বিদ্যুতের আলোতে আবার দেখতে পেল স্পিডবোটটা বিশাল ঢেউয়ের উপর অসহায়ভাবে নাচানাচি করছে।

"স্পিডবোটটা নিশ্চয়ই ডুবে যাবে— " বকুল ফিসফিস করে বলল, "হে খোদা, তুমি মানুষগুলোকে বাঁচাও!"

প্রচণ্ড ঝড়ে নিজেকে কোনমতে স্থির করে রেখে বকুল তীক্ষ্ণচোখে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে হৈচৈ শোনো যাচ্ছে, বড় ঝড় হলে আজান দেওয়া শুরু হয়, বকুল কান পেতে শুনতে পেল মণ্ডলবাড়ি থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, বৃষ্টির মাঝে, মানুষের আর্তচিৎকারের মাঝে আজান শুনলে কেমন জানি আতঙ্কের মতো হয়। বকুল সেই ভয়ংকর পরিবেশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল, আরেকবার বিজলি চমকানোর সাথে সাথে বকুল দেখল স্পিডবোটটি নেই।

বকুল নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে, প্রচণ্ড ঝড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে, বৃষ্টির ছাটে চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না তবু সে চোখ খুলে তাকিয়ে রইল পরের বিদ্যুৎঝলকের জন্যে। সত্যি সত্যি আরেকবার বিদ্যুৎ চমকে উঠলে বকুল দেখল স্পিডবোটটি নেই, নদীর প্রবল ঢেউয়ে দুজন মানুষের মাথা ভাসছে, হাত নড়ছে কিছু-একটা ধরে ভেসে থাকার চেষ্টায়। স্রোতের টানে মানুষগুলো ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণে। শুধু তাই নয়, বকুলের মনে হল ঝড়ের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের শব্দ ছাড়িয়ে সে শুনতে পেল মানুষের আর্তচিৎকার।

ডুবে যাবে মানুষগুলো—বকুলের মাথায় বিদ্যুৎঝলকের মতো খেলে গেল, কিছু-একটা করা না গেলে মানুষ দুটি ভেসে যাবে, কেউ আর তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই প্রচণ্ড ঝড়ে মানুষ দুজন কিছুতেই সাঁতরে তীরে আসতে পারবে না, ঢেউয়ের ধাক্কায় শেষ হয়ে যাবে দুজনে। কিছু-একটা করতে হবে বকুলের।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল বকুল, কিন্তু ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দে কেউ তার চিৎকার শুনতে পারল না। শুনতে পেলেও কিছু লাভ হত না, এই প্রচণ্ড ঝড়ে কে যাবে তাদের উদ্ধার করতে?

"টুশকি!" হঠাৎ করে বকুলের টুশকির কথা মনে পড়ল। শুধুমাত্র টুশকিই পারবে তাদের বাঁচাতে —এই প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের কাছে সাঁতরে যেতে পারবে শুধু টুশকি। বকুল ছুটে গেল হিজল গাছটার কাছে, ঝড়ে ডালগুলো নড়ছে মনে হচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে আছড়ে পরবে নদীর কালো পানিতে। বৃষ্টিতে ভিজে পিছল হয়ে আছে গাছটি, সাবধানে নিচের ডালে উঠে দাঁড়াল বকুল, বাতাসের ঝাপটায় সে পড়ে যেতে চাইছে নিচে, তার মাঝে শক্ত করে ধরে রাখল মোটা ডালটা। চাবুকের মতো ছুটে আসছিল সরু ডালগুলো, শরীর নিশ্চয়ই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে তার—বুঝতে পারছে না এখন।

গাছের ডালের নিচে নেমে এসে সে ডালটাকে ঝাঁকাতে লাগল গায়ের জোরে, পানিতে ডালগুলো শব্দ করতে লাগল। টুশকিকে ডাকতে হলে সে এখানে এসে ডালগুলোকে ঝাঁকিয়ে শব্দ করে। কখনোই সমস্যা হয়নি আগে, প্রত্যেকবারই ডেকে এনেছে টুশকিকে। কিন্তু এখন এই ঝড়ের প্রচণ্ড উথালপাতাল শব্দে কি টুশকি শুনতে পাবে পানিতে ডাল ঝাপটানোর শব্দ? আসবে কি টুশকি ?

হিজল গাছের ডালটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বকুল যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল ঠিক তখন হঠাৎ নদীর কালো পানির মাঝে থেকে ভুস করে টুশকি বের হয়ে এল।

"টুশকি!" বকুল চিৎকার করে বলল "টুশকি! এসেছ?"

টুশকি বকুলের কথা বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু পানিতে ঘুরে এসে আবার ভুস করে ভেসে উঠে লাফিয়ে উপরে উঠে এল। ঝড়ের মাঝে বকুলের যেরকম আনন্দ হয়, টুশকিরও ঠিক সেরকম আনন্দ হয় বলে মনে হচ্ছে।

"টুশকি! আমি আসছি—" বলে বকুল নদীর ফুঁসে-ওঠা কালো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকার পানিতে ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে ঝড়ের প্রবল গর্জন, বাতাসের শব্দ বৃষ্টির ছাট সবকিছু অদৃশ্য হয়ে একটা সুমসাম নীরবতা নেমে এল চারপাশে। পানির নিচে ডুবে থেকে আবার ডাকল বকুল, "টুশকি!" মুখ থেকে বাতাসের বুদ্বুদ বের হয়ে এল তার কথার সাথে সাথে।

বকুল হঠাৎ তার নিচে টুশকির মসৃণ শরীরের স্পর্শ অনুভব করল, সাথে সাথে জাপটে ধরে পা দিয়ে পেটে একটা খোঁচা দিল টুশকিকে। টুশকি বকুলকে পিঠে নিয়ে ছুটে গিয়ে পানির উপরে লাফিয়ে উঠে আবার পানিতে আছড়ে পড়ল। টুশকি ভাবছে বকুল বুঝি তার সাথে খেলার জন্যে তাকে ডেকে এনেছে।

বকুল টুশকির গলা জড়িয়ে ধরে মাথার কাছে বারকয়েক থাবা দিল, চাপা গলায় চিৎকার করে বলল, "সামনে, সামনে চল। মানুষ ডুবে যাচ্ছে।"

টুশকি বকুলের কথা বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না কিন্তু হঠাৎ গতি পালটে নদীর গভীরের দিকে রওনা দিল। প্রচণ্ড ঝড়ে মনে হচ্ছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, পানির ঢেউয়ের আঘাতে তলিয়ে নিচ্ছে সবকিছু, তার মাঝে তীরের মতো ছুটে যেতে থাকল টুশকি, তার গলা ধরে শক্ত করে ঝুলে রইল বকুল।

মানুষ দুটি ভেসে ভেসে যেখানে চলে যেতে পারে মোটামুটি সেদিকে ঘুরিয়ে নিতে থাকে টুশকিকে। পানির নিচে দিয়ে যেতে চায় মাঝেমাঝেই—নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেই খোঁচা দিয়ে টুশকিকে উপরে তুলে আনতে হয় তখন নিশ্বাস নেবার জন্যে। প্রচণ্ড ঢেউ বৃষ্টির ঝাপটা আর বাতাসের শোঁশোঁ শব্দের মাঝে বকুল টুশকির পিঠে করে ছুটে যেতে থাকে। নদীর মাঝামাঝি পানির প্রচণ্ড স্রোত, বকুল মাথা তুলে তাকাল, কাউকে দেখা

যাচ্ছে কি না খোঁজার চেষ্টা করল কিন্তু কেউ নেই। বকুল টুশকির পিঠে থাবা দিয়ে আবার ছুটে চলল সামনে, গোল হয়ে ঘুরে এল একবার, এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বকুল মাথা তুলে চিৎকার করে একবার ডাকল, "কো-থা-য় ? কো-থা-য় কে?"

সাথে সাথে মানুষের ক্ষীণ একটা চিৎকার শুনতে পেল, "এই যে এখানে।"

বকুল গলার আওয়াজের শব্দ লক্ষ্য করে টুশকিকে সেদিকে নিয়ে যেতে থাকে, কিছুক্ষণের মাঝেই সে মানুষ দুজনকে দেখতে পায়, নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে দুজনে। হুটোপুটি করে তারমাঝে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে কোনো রকমে, বকুল চিৎকার করে বলল, "আসছি আমি।"

টুশকি প্রথমে অপরিচিত মানুষ দুজনের কাছে যেতে রাজি হচ্ছিল না, বকুলকে বারকতক চেষ্টা করে তাকে রাজি করাতে হল। টুশকি কাছে যেতেই একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে টুশকিকে ধরতেই টুশকি গা-ঝাড়া দিয়ে পানির নিচে ডুবে গেল। বকুল টুশকিকে ছাড়ল না, পা দিয়ে পেটে খোঁচা দিয়ে আবার তুলে আনল উপরে। বকুল আবার টুশকিকে কাছে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, "আমার হাত ধরেন।"

মানুষটা তার হাত জাপটে ধরল। বকুল মানুষটাকে কাছে টেনে এনে চিৎকার করে বলল, "টুশকির গায়ে হাত দেবেন না—আপনাকে চেনে না, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে।"

বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দে বকুলের কথা শুনতে পেল না মানুষটা, চিৎকার করে বলল, "কী?"

বকুল আবার বলল চিৎকার করে, মানুষটা এবারে কথা বুঝতে পারল। বকুল এবারে দ্বিতীয় মানুষটার কাছে নিয়ে গেল টুশকিকে। পানিতে ভেসে যাবে না, কেউ-একজন এসেছে সাহায্য করতে এই ব্যাপারটাতেই মানুষ দুজন খুব সাহস ফিরে পেয়েছে। বকুল টুশকিকে নিয়ে কাছে গেলে বিদেশী সাহেবটা সাবধানে বকুলের শরীর ঝাপটে ধরল। বকুল তখন টুশকিকে ইঙ্গিত দিতেই সেটা তীরের দিকে সাঁতার কাটতে থাকে।

দুষ্টুমি করার জন্যে কি না কে জানে মাঝেমাঝেই টুশকি পানির গভীরে চলে যাচ্ছিল, যখন ওদের নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছিল তখন আবার ভুস করে পানির উপরে উঠে আসছিল। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে তীরে আসতে আসতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল, ততক্ষণে ঝড়ের বেগ একটু কমেছে, নদীর তীরে বেশকিছু মানুষ জমা হয়েছে ব্যাপারটি দেখার জন্যে। হিজল গাছের নিচে এসে টুশকি পানিতে ডুবে গেল, মানুষ দুজন তখন বকুলকে ছেড়ে দিয়ে কোনমতে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করে। নদীতীরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা এসে মানুষ দুজনকে টেনে উপরে তুলে নিয়ে আসে। নদীতীরে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে যায়, তাদের দুজনকে কোথায় নেবে কী করবে সেটা নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হতে থাকে। বকুল সেটা দেখার জন্যে আর দাঁড়াল না। একটু আগে সে যেটা করেছে তার জন্যে বাড়িতে বাবা-মার কাছে তার যে কপালে অনেক বড় দুঃখ আছে সেটা বুঝতে বকুলের খুব দেরি হল না।

ঝড়টা যেরকম হঠাৎ করে এসেছে ঠিক সেরকম হঠাৎ করে থেমে গেল। সারা গ্রামে অবিশ্যি ভাঙা গাছ, পাতা উড়ে আসা ছাউনি, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র পড়ে রইল। এই ভয়ংকর ঝড়ের মাঝে বকুল কী করেছে যখন সবে-মাত্র সেই খবরটা বের হতে শুরু করেছে এবং বাবা-মা বড়চাচা বকুলকে বকাবকি করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন তখন উত্তেজিত শরিফ এসে খবর দিল একজন বিদেশী সাহেব আর একজন দেশী সাহেব বকুলের সাথে দেখা করতে চায়।

বকুল সাথে সাথে বুঝতে পারল মানুষগুলো কে এবং কেন এসেছে। সে বাইরে বের হয়ে এল, মানুষ দুজনকে ঘিরে গ্রামের অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে, ছোট ছোট বাচ্চারা বেশ অবাক হয়ে বিদেশী সাহেবটাকে দেখছে, তারা হাফপ্যান্ট পরা এরকম বিচিত্র গোলাপি রঙের মানুষ আগে কখনো দেখেনি।

দেশী সাহেবটা এগিয়ে এসে বলল, "এই মেয়ে—তু—তুই বুঝি শুশুক নিয়ে আমাদের কাছে গিয়েছিলি?"

লোকটার কথার ভঙ্গি শুনে বকুলের মাথার মাঝে একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ হল। ইচ্ছে হল লাফিয়ে গিয়ে মানুষটার টুঁটি চেপে ধরে। বিদেশী সাবেহটা ইংরেজিতে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এই মেয়েটাই। সাহসী মেয়ে। চালাক মেয়ে।"

দেশী সাহেবটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ভেজা মানিব্যাগ বের করে, সেখানে থেকে ভেজা দুটি পাঁচশো টাকার নোট বের করে বকুলের দিকে এগিয়ে দিল। বকুলের ইচ্ছে করল খামচি দিয়ে মানুষটার মুখ রক্তাক্ত করে দেয়, কিন্তু সে কিছুই করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মানুষটি বলল, "নে।"

বকুল চারিদিকে তাকাল, অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তাদের ঘিরে। বামদিকে মণ্ডলবাড়ির সাদাসিধে কামলা বদিও আছে, চোখেমুখে সরল একটা বিস্ময় নিয়ে দেখছে। বকুল হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বদির দিকে এগিয়ে দিতেই বদি এগিয়ে এসে লোভীর মতো ছোঁ মেরে নোট দুটি নিয়ে নিল। দেশী সাহেব আহত গলায় বলল, "এটা বিশ টাকার নোট না, পাঁচশ টাকার নোট!"

বকুল বদির দিকে তাকিয়ে বলল, "বদি ভাই, এগুলো পাঁচশো টাকার নোট।"

দেশী সাহেবটা অবাক হয়ে বকুলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে অপমানের একটা ছায়া পড়েছে। মানুষটা বকুলের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বলল, "তু-তু-তুই—"

বকুল মুখ শক্ত করে বলল, "তুই না। তুমি।"

মানুষটির মুখ অপমানে লাল হয়ে যায়। একবার ঢোক গিলে বলল, "মানে বলছিলাম আমার ব্যাগে আসলে টাকা নেই—তাই মানে তোকে—মানে তোমাকে—"

বকুল বলল, "আপনার সাথে আমার কথা বলার সময় নেই, স্কুলের পড়া করতে হবে—আমি গেলাম।"

তারপর মানুষটাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে আসে, রাগে দুঃখে অপমানে তার চোখে পানি এসে যেতে চায়। তাকে ঘিরে যদি এতগুলো মানুষ না থাকত তা হলে সে কি খামচি দিয়ে লোকটার মুখ আঁচড়ে দিত না?

৮

প্রথম দিন বকুল ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিল না। হিজল গাছটার ডালটাকে পানিতে ঝাপটিয়ে শব্দ করার পরেও টুশকি এল না। হতে পারে নদীর নিচে কিংবা এত দূরে কোথাও গেছে যে তাকে যে ডাকা হচ্ছে সেটা সে শুনতে পায়নি।

দ্বিতীয় দিনে ব্যাপারটিতে বকুল বেশ চিন্তার মাঝে পড়ে যায়। সারাদিনই সে ছাড়াছাড়া ভাবে টুশকিকে ডেকেছে কিন্তু টুশকির দেখা নেই। তৃতীয় দিন বকুল ঘুম থেকেই উঠল একটা চাপা দুশ্চিন্তা নিয়ে, যদি আজকেও টুশকিকে পাওয়া না যায়?

সত্যি সত্যি সারাদিন টুশকিকে ডাকাডাকি করেও কোন লাভ হল না। বকুলের ইচ্ছে হল সে চিৎকার করে কাঁদে। বিকেলবেলা যখন কেউ আশেপাশে নেই তখন সে সত্যি সত্যি খানিকক্ষণ কাঁদল। কোথায় গেল তার টুশকি? তাকে ছেড়ে চলে গেছে সেটা তো হতে পারে না!

দেখতে দেখতে আরও দুদিন কেটে গেল, এখনও টুশকির কোন দেখা নেই। বকুল শুকনো-মুখে নদীর তীরে ঘুরোঘুরি করে, নদীর পানিতে পা ভিজিয়ে বসে থাকে, হিজল গাছের ডাল পানিতে ঝাপটিয়ে শব্দ করে। সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সত্যি টুশকি হারিয়ে গেছে, আর কোনদিন তাকে ফিরে পাবে না। বুকের ভিতরটা তার মোচড় দিতে থাকে, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়, সে বিছানায় উঠে বসে থাকে। জানালা দিয়ে সে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে, না জানি কোথায় কোন্ বিপদে পড়েছে টুশকি!

এক সপ্তাহ পর এক শুক্রবার সন্ধেবেলা শরিফ ছুটতে ছুটতে এল বকুলের কাছে, দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে গেছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না। কিছু-একটা বলতে চাইছে কিন্তু উত্তেজনায় বলতে পারছে না কিছু। বকুল ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

"টুশকি!"

"টুশকি? কোথায়?"

"টেলিভিশনে।"

"টেলিভিশনে?"

"হ্যাঁ।" শরিফ লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে বলল, "মণ্ডলবাড়িতে টেলিভিশনে খবরে টুশকিকে দেখিয়েছে। ঢাকায় টুশকিকে নিয়ে একটা সার্কাস হচ্ছে।"

"সার্কাস?"

"হ্যাঁ।"

বকুল হতবাক্ হয়ে বসে রইল। পুরো ব্যাপারটা এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাদের টুশকিকে ধরে নিয়ে সেটা দিয়ে সার্কাস দেখানো হচ্ছে! বকুল আবার জিজ্ঞেস করল, "তুই নিজে দেখেছিস?"

"আমি নিজে দেখেছি।" শরিফ বুকে থাবা দিয়ে বলল, "খোদার কসম।"

বাংলা খবরে যেটা বলা হয় সেটা রাত দশটার ইংরেজি খবরেও বলা হয় কাজেই রাত দশটার সময় বকুল মণ্ডলবাড়িতে হাজির থাকল। মণ্ডলবাড়িতে টেলিভিশন আছে, সেটা দেখতে গ্রামের অনেক মানুষ এসে ভিড় জমায়, বাইরের ঘরে মানুষ গিজগিজ করতে থাকে, তার মাঝে বকুল খানিকটা জায়গা করে নিল। ইংরেজি খবর শুনে কেউ বিশেষ কিছু বোঝে না বলে অনেকেই তখন চলে গেল, বকুল সুযোগ পেয়ে একেবারে কাছে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। সত্যি সত্যি খবরের শেষের দিকে হঠাৎ করে টেলিভিশনে টুশকিকে দেখানো হল, টুশকি পানির মাঝে ভুস করে বের হয়ে আসছে, অসংখ্য মানুষ হাততালি দিচ্ছে। তারপর খবরের একজন মানুষ কয়েকজন মানুষের সাক্ষাৎকার নিল, খবরটি ইংরেজি হলেও সাক্ষাৎকারটি বাংলা। বকুল শুনতে পেল মানুষগুলো বলছে যে বিদেশে যেরকম ডলফিনের খেলা দেখানো হয় তারাও সেরকম বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ

শুশুকের খেলা দেখাচ্ছে। তারা আপাতত একটি শুশুক দিয়ে শুরু করছে, কয়েকদিনের মাঝেই আরও শুশুক নিয়ে আসবে। যে-মানুষটি সাক্ষাৎকার নিচ্ছে সে তখন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কীভাবে শুশুককে খেলা দেখানো শিখাচ্ছেন?"

"আমাদের সেজন্যে বিদেশ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষ আনা হয়েছে, তাদের একজন হচ্ছেন পিটার ব্লাংক।"

তখন পিটার ব্লাংককে দেখানো হল এবং বকুল চমকে উঠে দেখল পিটার ব্লাংক হচ্ছে ঝড়ের মাঝে স্পিডবোট ডুবে-যাওয়া যে-মানুষটিকে সে উদ্ধার করেছিল সে। খবরের প্রতিবেদনে আরও অনেক কিছু বলা হল, যে-প্রতিষ্ঠানটি বিনোদনের জন্যে এই খেলা দেখাচ্ছে তাদের নাম 'ওয়াটার ওয়ার্ল্ড'। তাদের খেলা দেখানো হয় প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা এবং সন্ধে সাতটার সময়। যেখানে খেলাটি দেখানো হচ্ছে সেই জায়গাটি নাম 'উত্তরণ', বনানীর কাছাকাছি সেটি একটি নতুন এলাকা।

পলাশপুর গ্রামের সবাই বকুলকে এবং টুশকিকে দেখেছে কাজেই সবাই টেলিভিশনের টুশকিকে চিনতে পারল। তারা এমন ভান করতে লাগল যে এটা টুশকির বিশাল একটা সৌভাগ্য যে তাকে টেলিভশনে দেখানো হচ্ছে। নদী থেকে তাকে ধরে নেওয়া যে একটা অন্যায় কাজ সেটা একজনও বুঝতে পারল না। মণ্ডলবাড়ি থেকে বকুল প্রায় চোখে পানি নিয়ে বের হল। অন্ধকার পথে বাড়ি ফিরে আসতে আসতে বকুল ঠিক করে ফেলল সে কাল ভোরেই ঢাকা যাবে। নীলাকে ঘটনাটা খুলে বললে নীলার আব্বু নিশ্চয়ই কিছু-একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। তার কাছে নীলার ঠিকানা আছে, ঢাকা শহরে গেলে নীলার বাসা খুঁজে বের করা কঠিন হবার কথা নয়।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বকুল কীভাবে কী করবে চিন্তা করতে থাকে। একা একা ঢাকা পৌঁছানো মনে হয় সবচেয়ে কঠিন অংশটুকু। সে যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হত তা হলে কোন সমস্যাই ছিল না। বারো-তেরো বছরের একটা মেয়ে একা একা ঢাকা যায় না, কিন্তু তাকে যেতেই হবে। তাদের স্কুল থেকে মাইলখানেক উত্তরে ঢাকা যাবার রাস্তা, সেখানে ঢাকা যাবার বাস থামে। কোনভাবে সেটাতে উঠে পড়লে একটা-কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সঙ্গে আর কাউকে নিতে পারলে হত, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করে সে একাই যাবে বলে ঠিক করল। ঢাকা যাবার জন্যে কিছু টাকা-পয়সা দরকার, সে তার পয়সা জমানোর কৌটায় যে পয়সা জমিয়ে এসেছে সেটা মনে হয় যথেষ্ট নয়। বাজারে রহমত চাচার মনোহারী দোকান থেকে বাবার কথা বলে কিছু টাকা ধার করা যেতে পারে, বেশ কিছুদিন আগে একবার বাবা তাকে দিয়ে কিছু টাকা আনিয়ে নিয়েছিলেন। স্কুলের বেতনের কথা বলে মায়ের কাছ থেকেও কিছু টাকা নেওয়া যেতে পারে।

পরদিন সকালে স্কুলে যাবার কথা বলে সে তাদের গ্রামের অন্য বাচ্চাদের সাথে বের হল। মাকে স্কুলের বেতনের কথা বলে কিছু টাকা নিয়েছে। নিজের জমানো খুচরা টাকাও আছে সাথে। বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় বাবার কথা বলে রহমত চাচার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে নিল। এখন ঢাকা যাওয়ার এবং ঢাকায় পৌঁছানোর পর নীলার বাসায় যাবার জন্যে রিকশা ভাড়াটুকু উঠে গেছে মনে হয়। স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে সে তার বই-খাতা রতনের কাছে দিয়ে বলল বিকেলবেলা সেগুলো তার বাসায় পৌঁছে দিতে।

রতন চোখ কপালে তুলে বলল, "সেকী! তুমি কোথায় যাচ্ছ বকুলাপ্পু?"

"ঢাকায়।"

"ঢাকায়? কার সাথে?"

"একা।"

রতন মুখ হাঁ করে বলল, "একা?"

"হ্যাঁ। টেলিভিশনে দেখিসনি টুশকিকে চুরি করে নিয়েছে?"

রতন মাথা নাড়ল, সে নিজে দেখেনি, কিন্তু ঘটনাটার কথা শুনেছে। সে ঢোক গিলে বলল, "তুমি কী করবে?"

"টুশকিকে বাঁচাতে হবে না?"

"কেমন করে বাঁচাবে?"

"সময় হলেই জানবি। যদি বিকেলের মাঝে ফিরে না আসি তা হলে বাড়িতে বলিস আমি নীলাদের বাসায় গেছি।"

"তোমার বাড়িতে চিন্তা করবে না বকুলাপ্পু?"

"সেটা তো করবেই। বলিস নীলা আর তার আব্বু গাড়ি করে এসে আমাকে নিয়ে গেছে। তা হলে বেশি চিন্তা করবে না। বলতে পারবি না?"

রতন দুর্বল গলায় বলল, "পারব।"

"যদি না বলিস তোর মাথা ছিঁড়ে ফুটবলের মতো কিক দিয়ে নদীর ঐ পাড়ে পাঠিয়ে দিব। মনে থাকে যেন।"

রতন আবার ঢোক গিলে বলল তার মনে থাকবে।

ঢাকায় যাবার অংশটুকু নিয়ে সে যত ভয় পেয়েছিল দেখা গেল ব্যাপারটা তত কঠিন হল না। ছাদে এবং ভিতরে মানুষে বোঝাই গাদাগাদি ভিড়ের একটা বাসে উঠে যাবার সময় সবাই মনে করতে লাগল সে কারও সাথে উঠেছে। কন্ডাক্টর ভাড়া নেবার সময় বুঝতে পারল সে একা—তখন বকুল ভান করতে লাগল তার সাথে যে এসেছে সে বাসের ছাদে উঠেছে। কন্ডাক্টর ভাড়া পেয়েই খুশি, কার সাথে কে এসেছে, কে ছাদে উঠেছে এবং কে নিচে বসেছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না।

ঢাকা শহরে নেমে নীলার বাসায় যাওয়া নিয়ে একটা বড় সমস্যা হল। যেখানে বাসে নেমেছে সেখান থেকে কোন রিকশাই নীলাদের এলাকায় যেতে রাজি হল না—সেটা নাকি অনেক দূর। কী করবে সেটা নিয়ে যখন বকুল খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে তখন হঠাৎ করে তার ফোন করার কথা মনে পড়ল। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে একটি দোকান পেয়ে গেল যার বাইরে বড় বড় করে লেখা 'ফোন ফ্যাক্স'। ভিতরে ঢুকে মানুষটাকে নীলাদের বাসার টেলিফোন নম্বরটা দিতেই মানুষটা তাকে নম্বরটা ডায়াল করে টেলিফোনটা এগিয়ে দিল। বকুল এর আগে জীবনে টেলিফোনে কথা বলেনি, কী করতে হয় সে জানেও না। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে সে কিছু-একটা শোনার চেষ্টা করতে থাকে, খানিকক্ষণ পিঁপি একটা শব্দ হয়ে হঠাৎ সে একটা মেয়ের গলায় শব্দ শুনতে পেল, "হ্যালো!"

"নীলা?"

"হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?"

"নীলা, আমি বকুল।"

"বকুল!" টেলিফোনে নীলা একটা বিকট চিৎকার দিল "তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?"

"ঢাকা থেকে।"

"ঢাকা কোথায়? কার কাছে এসেছ? কখন এসেছ?"

"একসাথে এত কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। আমি এক্ষুনি এসেছি।"

"কার কাছে?"

"তোমার কাছে। খুব দরকার।"

নীলা শঙ্কিত গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

"টুশকি চুরি হয়ে গেছে।"

"কী বললে?" নীলা চিৎকার করে বলল, "কী বললে?"

"টুশকিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি টেলিভিশনে দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছ—দাঁড়াও তুমি কোথায়?"

"আমি জানি না।"

"কোথা থেকে ফোন করছ?"

"একটা দোকান থেকে।"

"দোকানটা কোথায়?"

"সেটাও জানি না।"

"তুমি দোকানের মানুষের কাছে টেলিফোনটা দিয়ে এখানে বসে থাকো আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। অন্য কোথাও যাবে না। ঢাকা শহরে কেউ হারিয়ে গেল তাকে আর পাওয়া যায় না।"

"ঠিক আছে।"

নীলা ফোনের দোকানের মানুষের সাথে কথা বলে ঠিকানাটা নিয়ে আধঘন্টার মাঝে বিশাল একটা গাড়ি নিয়ে চলে এল। গাড়ি করে যেতে যেতে বকুলের কাছে সবকিছু শুনতে শুনতে নীলার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে হাতে কিল মেরে বলল, "কত বড় সাহস দেখেছ! আমাদের টুশকিকে চুরি করে নিয়ে যায়!"

"এখন কী করবে?"

"তুমি কোন চিন্তা করবে না, আমি সব ব্যবস্থা করব। আব্বুকে বললেই দেখো আব্বু একটা ব্যবস্থা করে দেবে।"

বকুল মাথা নাড়ল। নীলার আব্বু নিশ্চয়ই কিছু-একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, সে-ব্যাপারে বকুলের কোন সন্দেহ নেই।

নীলা একটু ইতস্তত করে বলল, "শুধু একটা সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

"আব্বু ঢাকায় নেই।"

"কোথায় গিয়েছেন?"

"সিঙ্গাপুর।"

"কবে আসবেন?"

নীলা মাথা চুলকে বলল, "জানি না।"

ঢাকার রাস্তায় গাড়ি দুজনকে নিয়ে যেতে থাকে, নীলা হাতে কিল দিয়ে বলল, "আমাদেরকেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে।"

বকুল ভয়ে ভয়ে বলল, "আমাদেরকেই?"

"হ্যাঁ, আমাদেরকেই। আমাকে আর তোমাকে।"

নীলাদের বাসায় পৌঁছে বকুল একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল। মানুষের বাসা যে কখনো এত সুন্দর হতে পারে সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাসার এক-একটা বাথরুম এত বড় যে মনে হয় ভিতরে ফুটবল খেলা যায়। বকুল হাত-মুখ ধুয়ে

যে-তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল সেটা এত নরম যে মনে হল বুঝি ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। বকুল আর নীলা যে-খাবারের টেবিলে খেতে বসল সেটা কুচকুচে কালো পাথরের তৈরি। টেবিলটি এত মসৃণ যে শুধু হাত বুলাতে ইচ্ছে করে।

বকুল আর নীলা খেতে খেতে আলাপ করতে থাকে। নীলা বলল, "আব্বু নেই তাই খুব মুশকিল হল কিন্তু আব্বু থাকলে যেটা করতেন আমরা সেটাই করব।"

"সেটা কী?"

"শমশের চাচা!"

নীলা তখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "শমশের চাচা—শমশের চাচা!'

সাথে সাথে প্রায় নিঃশব্দে শমশের এসে ঢুকল, বলল, "আমাকে ডাকছ নাকি, নীলা?"

"হ্যাঁ শমশের চাচা। বকুল একটা খবর নিয়ে এসেছে, একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কী খবর?"

"টুশকির কথা মনে আছে না? সেটা চুরি হয়ে গেছে।"

শমশের চাচা নিজের নখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "হ্যাঁ। আমি টেলিভিশনে দেখেছি। ওয়াটার ওয়ার্ল্ড নাম দিয়েছে, সেখানে শুশুকদের খেলা দেখানো হয়।"

নীলা চোখ বড় বড় করে বলল, "হ্যাঁ, সেখানে টুশকিকে চুরি করে এনেছে।"

শমশের কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নীলা বলল, "টুশকিকে উদ্ধার করতে হবে শমশের চাচা। কতক্ষণ লাগবে?"

শমশের চাচা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "টুশকিকে এত সহজে উদ্ধার করা যাবে না নীলা।"

নীলা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কেন?"

"টুশকি কারও সম্পত্তি ছিল না। সেটা নদীর একটা শুশুক। নদীর যে-কোন মাছ যেমন ধরা যায় ঠিক সেরকম যে-কোন শুশুককও ধরে আনা যায়—"

বকুল প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "টুশকি আমাদের শুশুক। আমাদের— আমার—"

শমশের একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি জানি। কিন্তু আইনের দিক দিয়ে তোমার ছিল না। এখন এটা আইনের দিক দিয়ে ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের। তারা যদি ছেড়ে না দেয় আমাদের কিছু করার নেই।"

নীলা প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "কিছু করার নেই?"

শমশের একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "না, নেই। স্যার যদি থাকতেন তা হলে কিছু করতে পারতেন।"

"শমশের চাচা! আব্বুকে এক্ষুনি ফোন করেন। এক্ষুনি।"

৯

বিকেল পাঁচটার সময় ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে টুশকির একটা অনুষ্ঠান রয়েছে, নীলা আর বকুল সেটা দেখতে যাবে। একেবারে সামনে বসে দেখার জন্যে দুইটা টিকেট কেনা হয়েছে। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে এসে বকুল একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল, এত সুন্দর যে একটা জায়গা হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব না। বেহেশত মনে হয় এরকম

হবে। নীলা পৃথিবীর অসংখ্য জায়গা দেখেছে, তাকেও স্বীকার করতে হল জায়গাটা সুন্দর। বিরাট জায়গা নিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে। সামনে প্লেক্সি গ্লাসের বিশাল একটা ট্যাংক, তার সামনে গ্যালারির মতো চেয়ার উঠে গেছে। ট্যাংকটা একটা বড় সাইজের পুকুরের মতো, তার মাঝখানে দ্বীপের মতো জায়গা ভেসে আছে, সেখানে উজ্জ্বল রঙের নকশা। পুরো এলাকাটা উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত করে রাখা আছে, দেখেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ভিতরে বিশাল স্পিকারে দ্রুত লয়ে বাজনা বাজছে, পুরো এলাকাটাতে একটা উৎসব-উৎসব ভাব।

বকুল আগে কখনো এরকম জায়গায় আসেনি, সবকিছু দেখে সে হতবাক্ হয়ে গেল। বিশাল গ্যালারির মতো জায়গা, সেখানে আস্তে আস্তে মানুষজন এসে নিজেদের জায়গায় বসে। যারা এসেছে তাদের মাঝে কমবয়সী বাচ্চারাই বেশি। টিকেটের অনেক দাম, যারা আসতে পারে তাদের সবাই বড়লোকের ছেলেমেয়ে, চেহারায় জামাকাপড়ে সেটা বেশ স্পষ্ট।

ঠিক পাঁচটার সময় অনুষ্ঠান শুরু হল। নানারকম অনুষ্ঠান রয়েছে, ম্যাজিক শো, হাস্যকৌতুক, বানরের খেলা, পাখির খেলা, শারীরিক কসরত, নাচ-গান— সবকিছুর শেষে হচ্ছে শুশুকের খেলা। অনুষ্ঠানগুলো ভালো—অন্য যে-কোন সময় হলে দেখে বকুল হেসে কুটিকুটি হত, কিন্তু এখন ভিতরে অশান্তি তাই একটা অনুষ্ঠানও সে মন দিয়ে দেখতে পারল না।

সবকিছুর শেষে হঠাৎ স্টেজে বিচিত্র একধরনের বাজনা বাজতে শুরু করে। সাথে সাথে পানির ট্যাংকের এক পাশে একটা গেট খুলে দেওয়া হল। বকুল প্লেক্সি গ্লাসের স্বচ্ছ দেওয়ালের ভিতর দিয়ে দেখতে পেল একটা শুশুক দ্রুত-বেগে পানির ট্যাংকে এসে হাজির হয়েছে। শুশুকটা এসে সজোরে দেওয়ালে আঘাত করে, যেন সেটা ভেঙে ফেলতে চায়। বকুল উত্তেজনায় তার চেয়ারে দাঁড়িয়ে গেল—তার টুশকি!

নীলা ওর হাতে ধরে টেনে বসিয়ে দিল। বকুল বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, টুশকি পাগলের মতো ভিতরে ছোটাছুটি করছে, দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। সবাই মনে করছে এটা একধরনের খেলা, শুধু বকুল জানে এটা খেলা নয়, এটা একধরনের ক্রোধ। যে-টুশকি বিশাল নদীতে ঘুরে বেড়াত তাকে হঠাৎ করে এইটুকুন জায়গায় আটকে ফেললে সে কি সেটা সহ্য করতে পারে?

স্টেজে নীল পোশাক পরা একজন মানুষ এসে দাঁড়াল, এক হাতে চাবুকের মতো একটা জিনিস। অন্য হাতে একটা মাইক্রোফোন। মানুষটি স্টেজে এসে দাঁড়াতেই উপস্থিত সব দর্শকেরা আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করে। মানুষটা মাথা নুইয়ে সবার করতালি গ্রহণ করে বলল, "আপনারা এখন দেখতে পাবেন এক অভূতপূর্ব খেলা। লস এঞ্জেলস, ফ্লোরিডা, ভ্যানকুবারে ডলফিনের খেল দেখানো হয়। আমরাও বাংলাদেশে আমাদের নিজস্ব ডলফিন শুশুকের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করেছি। আপনারা দেখবেন পানির বিস্ময় এই শুশুকের বিচিত্র খেলা।"

বকুল আবার উঠে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, নীলা তাকে আবার টেনে বসিয়ে দিল। মানুষটি মাইক্রোফোনে বলল, "এই শুশুকটি আনা হয়েছে চন্দ্রা নদী থেকে। এটি একটি মেয়ে-শুশুক, এর ওজন প্রায় একশো কেজি এবং যে-জিনিসটা আপনাদের সবাইকে বলে রাখছি সেটা হল এটা একটা বন্য শুশুক। এটা বেপরোয়া শুশুক। এটা একটা খ্যাপা শুশুক!

"মানুষ বন্য হাতিকে পোষ মানায়, বন্য বাঘকেও পোষ মানায়। আমরা এই বন্য শুশুককেও পোষ মানানো শুরু করেছি। এটি লাফিয়ে রিঙের ভিতর দিয়ে পার হবে, একটা বলকে ছুড়ে দেবে, শূন্যে ডিগবাজি দেবে। যখন এটাকে পোষ মানানো হবে তখন সে আরও বিচিত্র খেলা দেখাবে। সেইসব খেল দেখার জন্য আপনাদেরকে এখনই আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি।

"বন্য শুশুককে পোষ মানানো খুব সহজ নয়। এটাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন এর শরীরে হিংস্র সিংহের শক্তি। লেজ দিয়ে আঘাত করে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে, মুখের কামড়ে শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিতে পারে। শক্তিশালী মাথা দিয়ে মানুষকে পিষে ফেলতে পারে।

"এই ভয়ংকর জলজন্তুকে আমরা পোষ মানানো শুরু করেছি। সেই পোষ মানানোর জন্যে সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছেন পি-টা-র-ব্লা-ংক! আপনারা করতালি দিয়ে এই মানুষটাকে অভ্যর্থনা জানান।"

সাথে সাথে পানির ট্যাংকে দ্বীপের মতো একটা জায়গায় একজন বিদেশী মানুষ এসে দাঁড়াল, তার শরীরে কালো রঙের রবারের একধরনের পোশাক। তার হাতেও চাবুকের মতো একটা জিনিস। সবাই প্রচণ্ড জোরে হাততালি দিতে শুরু করে।

মাইক্রোফোন-হাতের মানুষটা আবার কথা বলতে শুরু করল, "পিটার ব্লাংক পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ডলফিন-প্রশিক্ষক। তার হাতে রয়েছে ইলেকট্রিক চাবুক। যখন এই ভয়ংকর শুশুক তাঁর কথার অবাধ্য হয় তিনি এই ইলেকট্রিক চাবুকের তিন হাজার ভোল্ট দিয়ে তাকে আঘাত করেন। হিংস্র শুশুক তখন নিরীহ মোরগছানায় পালটে যায়!"

মানুষটা মোরগছানার কথা বলার সময় হেসে উঠল এবং তার কথায় দর্শকেরাও আনন্দে হেসে ওঠে। মানুষটা এবারে হাত তুলে বলল, "এখন দেখবেন বন্য শুশুকের খেলা!"

সাথে সাথে প্রচণ্ড জোরে একধরনের আদিম বাজনা বাজতে শুরু করে, পিটার ব্লাংক তার ইলেকট্রিক চাবুক ঘোরাতে শুরু করে এবং টুশকি ভয় পেয়ে পানি থেকে লাফিয়ে উপরে উঠে আসে। দর্শকেরা আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করল।

উপর থেকে একটা রিং ঝুলিয়ে দেওয়া হল, সেখানে কাপড় প্যাঁচানো, একটা দেয়াশলাই দিয়ে সেটাতে আগুন ধরিয়ে দিতেই পুরো রিংটা দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। শব্দ আরও দ্রুত হতে থাকে, সবাই দেখতে পায় শুশুকটা পানির ট্যাংকে পাগলের মতো ঘুরছে, পিটার ব্লাংক চাবুক দিয়ে আঘাত করতেই একটা আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করে শুশুকটা লাফিয়ে আগুনের রিঙের ভিতর দিয়ে যেতে চেষ্টা করে, সেটা ভিতর দিয়ে যেতে পারল না— জ্বলন্ত রিঙে আঘাত করে আবার পানিতে পড়ে গেল।

বকুল আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। "না-না-না— " বলে চিৎকার করতে করতে সে স্টেজের দিকে ছুটে যেতে থাকে। ছোট একটা মেয়েকে চিৎকার করে যেতে দেখে দর্শকেরা হতচকিত হয়ে গেল। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের লোকজন তাকে ধরার জন্যে ছুটে আসতে থাকে, তার আগেই বকুল প্লেক্সি গ্লাসের দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে গেছে। পানির ট্যাংকের দেয়ালে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে ডাকল, "টুশকি!"

গ্যালারিভরা অসংখ্য দর্শক অবাক হয়ে দেখল শুশুকটি হঠাৎ তীরের মতো ছুটে আসে বকুলের দিকে। বকুল প্লেক্সি গ্লাসের দেওয়াল থেকে নিচু পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পানি ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে, তার মাঝে সবাই স্পষ্ট দেখতে পায় মাছের মতো সাঁতার কাটছে

বাচ্চা একটা মেয়ে আর বিশাল একটা শুশুক এসে তাকে স্পর্শ করছে। মায়েরা যেভাবে সন্তানকে আলিঙ্গন করে ঠিক সেরকম ভালোবাসায় মেয়েটি আলিঙ্গন করছে শুশুকটিকে, দুজনে জড়াজড়ি করে পানির নিচে ঘুরপাক খেতে থাকে, ডিগবাজি খেতে থাকে। শুশুকটি তার মুখ দিয়ে বাচ্চা মেয়েটিকে আদর করতে থাকে আর গভীর ভালোবাসায় মেয়েটি শুশুকের সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। শুশুকটি মেয়েটিকে নিয়ে পানির ট্যাংকে ঘুরে বেড়াতে থাকে, আর মেয়েটি আদর করে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। সবাইকে অবাক করে মেয়েটাকে পিঠে নিয়ে শুশুকটা হঠাৎ পানি থেকে লাফিয়ে উঠে আবার পানির গভীরে চলে যায়।

উপস্থিত দর্শকেরা প্রথমে হতচকিত হয়ে বসে থাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর প্রচণ্ড জোরে হাততালি দিয়ে আনন্দধ্বনি দিতে থাকে। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের দুজন মানুষ স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকে বোকার মতো, কী করবে বুঝতে পারছে না তারা। মাইক্রোফোন-হাতের মানুষটি কয়েকবার উপস্থিত দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু কাউকে শান্ত করানোর কোনো উপায়ই নেই। দর্শকেরা এরকম দৃশ্য আগে কখনো দেখেনি।

ঠিক তখন দেখতে পেল পুতুলের মতো দেখতে আরেকটি মেয়ে স্টেজে উঠে গেছে, চিৎকার করে কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছে সবাইকে। দর্শকেরা হঠাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো চুপ করে গেল, তারা শুনতে চায় এই মেয়েটা কী বলবে।

নীলা চিৎকার করে বলল, "এই শুশুকটা বুনো শুশুক না। এটা পোষা শুশুক। এর নাম টুশকি।"

দর্শকেরা চিৎকার করে বলল, "শুনতে পাই না। মাইক্রোফোন, মাইক্রোফোন।"

নীলা নীল পোশাক পরা মানুষটার হাত থেকে মাইক্রোফোনটা প্রায় কেড়ে নিয়ে চিৎকার করে বলল, "এই শুশুকটা বুনো শুশুক না। এটা পোষা শুশুক। এর নাম টুশকি!"

দর্শকেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "টুশকি! টুশকি!"

সাথে সাথে টুশকি বকুলকে পিঠে নিয়ে আবার পানির ভিতর থেকে ভুস করে ভেসে উঠল উপরে।

"ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের লোকেরা টুশকিকে চুরি করে এনেছে। চুরি করে এনে তাকে শাস্তি দিচ্ছে। কষ্ট দিচ্ছে, ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে, আমরা একে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।"

দর্শকেরা চিৎকার করে উঠল, "ছেড়ে দাও! টুশকিকে ছেড়ে দাও।"

"টুশকি থাকে চন্দ্রা নদীতে। পুরো নদীতে সে ঘুরে বেড়ায়, তাকে ডাকলে সে আসে, সে খেলে, সে আমাদেরকে ভালোবাসে। আর এই যে দেখছেন বিদেশী মানুষ তারা গিয়ে টুশকিকে নদী থেকে ধরে এনেছে। সবাইকে বলছে এটা হিংস্র প্রাণী! টুশকি হিংস্র না। একটুও হিংস্র না।

"তাকে আমরা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। নিয়ে তাকে নদীতে ছেড়ে দেব। সে তার নদীতে ঘুরে বেড়াবে।"

উপস্থিত দর্শকেরা চিৎকার করে বলল, "ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!"

তারপর প্রায় সাথে সাথেই ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে ভাংচুর শুরু হয়ে গেল। লোকজন কিছু চেয়ার ভেঙে ফেলল, পর্দা ছিঁড়ে ফেলল, লাইট বাল্ব গুঁড়িয়ে দিল। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের লোকজনকে ধাওয়া করল। পানির ট্যাংকটা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে অবশ্যি বেশি সুবিধে করতে পারল না। ট্যাংকের পিছনে খুঁজে নীলা টুশকিকে নেওয়ার জন্যে একটা জিনিস পেয়ে গেল। একটা চটের থলের মতো। থলেটাকে ভালো করে ভিজিয়ে তার মাঝে

টুশকিকে শুইয়ে বকুল আর নীলা তাকে টেনে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে, সাথে সাথে বেশ কয়েকজন মানুষ তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এল।

মানুষজনের ভিড় দেখে টুশকি অশান্ত হয়ে ওঠে, লেজের আঘাতে সে দুই-একজনকে একেবারে কাবু করে ফেলল। বকুল মাথায় হাত বুলিয়ে ক্রমাগত কথা বলে বলে কোনমতে তাঁকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকে।

বাইরে নীলাদের গাড়ি রাখা ছিল। বড় একটা মাইক্রোবাস, ভিতরে অনেক জায়গা। পিছনের সিটে টুশকিকে শুইয়ে রাখা হল।

দর্শকদের একজন বলল, "পানির মাছ শুকনোয় মরে যাবে না?"

চশমা-পরা একজন বলল, "মরবে না। এটা তো মাছ না, এটা একটা প্রাণী। এটা নিশ্বাস নেয়।"

"নিশ্বাস নেয়?"

"হ্যাঁ, তবে পানির ভিতরে শরীরের ওজনটা টের পায় না, বাইরে ওজনটার জন্যে কষ্ট পাবে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"শরীরটা যেন শুকিয়ে না যায়। নদীতে গিয়ে ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত শরীরটাকে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে।"

সাথে সাথে উৎসাহী দর্শকদের একজন একটা বালতি করে পানি নিয়ে এল মাইক্রোবাসের ভিতরে।

গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসেছে শমশের। তার মুখে কখনো কোনো অনুভূতির চিহ্ন পড়ে না, এখনও মুখের ভাব দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। নীলা আর বকুল টুশকির পাশে বসেছে। টুশকির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "ড্রাইভার চাচা, চলেন।"

"কোথায়?"

"লঞ্চঘাটে।"

অসংখ্য দর্শক তখনও হৈচৈ করছে তার মধ্যে ভিড় ঠেলে মাইক্রোবাসটা বের হয়ে এল। গাড়িটা বড় রাস্তায় ওঠার পর শমশের একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ব্যাপারটা সামলানো কঠিন হবে।"

নীলা আর বকুল দুজনেরই নিজেদের যুদ্ধবিজয়ী বীরের মতো মনে হচ্ছিল তারা একটু অবাক হয়ে বলল, "কোন্ ব্যাপারটা?"

"এই যে টুশকিকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কেন?"

"মনে হয় না আমরা লঞ্চঘাট যেতে পারব। তার আগেই আমাদেরকে ধরবে।"

"কে ধরবে?"

"পুলিশ। কিংবা মিলিটারি। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের মালিক খুব শক্তিশালী মানুষ। আমাদের আবার কোন বিপদ না হয়।"

শমশেরের গলার স্বর শুনে নীলা হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়। শুকনো গলায় বলল, "কী বিপদ?"

"এদের সাথে আসলে অর্গানাইজড ক্রিমিনালের দলের যোগাযোগ আছে। এরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে।"

"তা হলে আমরা কী করব শমশের চাচা?"

"দেখি কী করা যায়।"

শমশের চিন্তিত মুখে বসে বসে কিছু-একটা ভাবতে লাগল। হাতে একটা সেলুলার ফোন ছিল, সেটা দিয়ে কোথায় কোথায় জানি ফোন করল। বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোতে অন্ধকার কেটে কেটে মাইক্রোবাসটি ছুটে চলছে নদীর দিকে।

শমশেরের আশঙ্কাকে অমূলক প্রমাণ করে মাইক্রোবাসটি একেবারে নদীর ঘাটে চলে এল। নীলাদের সাদা লঞ্চটি এখানে বাঁধা আছে, পাশে একটা ছোট কাজ চালানোর মতো জেটি। যখন মাইক্রোবাসের দরজা খুলে টুশকিকে ধরাধরি করে তারা নদীর দিকে যাচ্ছে ঠিক তখন যেন মাটি ফুঁড়ে ডজনখানেক মানুষ তাদেরকে ঘিরে দাঁড়াল। নীলা ভয়ে চিৎকার করে উঠে বলল, "কে?"

অন্ধকারে সামনাসামনি দাঁড়ানো একজন মানুষ এগিয়ে এসে বলল, "আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক। আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের পানির ট্যাংক থেকে একটা শুশুককে চুরি করা হয়েছে।"

বকুল চিৎকার করে বলল, "মিথ্যা কথা ! আমরা চুরি করি নাই। তোমরা চুরি করেছ। তোমরা— "

অন্ধকারে পিছন থেকে আরেকজন মানুষ বলল, "মিছিমিছি এদের সাথে আর্গুমেন্টে গিয়ে লাভ নেই। শুশুকটাকে ট্রাঙ্কুয়ালাইজ করো—নিয়ে যেতে হবে এখনই।"

নীলা আর বকুল অবাক হয়ে দেখল বিদেশী সাহেবটা তার ব্যাগ খুলে একটা বড় সিরিঞ্জ বের করে টুশকির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বকুল একটা চিৎকার করে সাহেবটার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, কিন্তু তার আগেই দুজন পিছন থেকে বকুলকে ধরে ফেলল। বকুল আঁচড়ে কামড়ে মানুষ দুজনকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছিল কিন্তু তবু মানুষগুলো তাকে ছাড়ল না।

বকুল আর নীলা অসহায় আক্রোশে ছটফট করতে করতে দেখল মানুষগুলো টুশকিকে ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল, তারপর ছোট একটা পানির টাংকে তাকে বসিয়ে দিল। ধরাধরি করে তখন সেই ছোট ট্যাংকটাকে বড় একটা পিকআপ ট্রাংকে নিয়ে তুলে ফেলল। ঠিক যখন পিকআপ ট্রাকটা স্টার্ট নেবে তখন হঠাৎ করে পুরো এলাকা একটা গাড়ির হেডলাইটে আলোকিত হয়ে গেল। শমশের নিচু গলায় বলল, "আর চিন্তা নেই।"

" কেন ?"

"স্যার এসে গেছেন।"

"সিঙ্গাপুর থেকে ?"

"সিঙ্গাপুর থেকে আগেই এসেছেন। আমি গোলমাল দেখে খবর পাঠালাম স্যারকে।"

গাড়িটা নদীর ঘাটে থামল। সেখান থেকে ইশতিয়াক সাহেব খুব ধীরেসুস্থে নামলেন। তার সাথে যে-মানুষটি নামলেন তিনি নিশ্চয়ই খুব বড় কোন মানুষ হবেন। কারণ তাঁকে দেখে সাদা পোশাকের পুলিশেরা খুব জোরে জোরে স্যালুট দেওয়া শুরু করল।

ইশতিয়াক সাহেবকে দেখে নীলা প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলল, "আব্বু দেখো টুশকিকে নিয়ে যাচ্ছে!"

ইশতিয়াক সাহেব খুব বিচলিত হলেন বলে মনে হল না। হাসিমুখে বললেন, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আব্বু। তুমি কিছু -একটা করো, না হলে এক্ষুনি নিয়ে যাবে।"

"তোরা যা কাণ্ড করেছিস আমার আবার কি করতে হবে? পুরো ওয়াটার ওয়ার্ল্ড নাকি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিস ?"

"আমরা মোটেই জ্বালাইনি আব্বু। পাবলিক জ্বালিয়েছে।"

ইশতিয়াক সাহেব হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "বাংলাদেশের পাবলিক খুব জ্বালাতে পোড়াতে পছন্দ করে, তাই না ?"

নীলা রাগ হয়ে বলল, "আব্বু তুমি এখনও হাসছ? তুমি জান ওরা টুশকিকে কী করেছে?"

ইশতিয়াক সাহেব সাথে সাথে গম্ভীর হবার ভান করে বললেন, "ঠিক আছে মা, এই দেখ হাসি বন্ধ করলাম।"

ইশতিয়াক সাহেব পিকআপ ট্রাকটার দিকে হেঁটে যেতে শুরু করলেন এবং প্রায় সাথেসাথেই পিকআপের ভিতর থেকে ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের একজন দেশী এবং একজন বিদেশী মানুষ নেমে এল। ইশতিয়াক সাহেব এগিয়ে গিয়ে খুব হাসিহাসি মুখে বললেন, "আমার নাম ইশতিয়াক আহমেদ। এই ছোট ডেঞ্জারাস মেয়েটা দেখছেন তার নাম বকুলাপ্পু, তার যে বন্ধু সে হচ্ছে নীলা আর আমি হচ্ছি নীলার বাবা। শুনলাম আমার মেয়ে আর বকুলাপ্পু নাকি কী একটা গোলামাল করেছে ?"

মানুষটা শুকনো গলায় বলল, "আমার নাম আবু কায়সার। আমি ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের জি. এম.। এখানে সব মিলিয়ে দশ মিলিওন ডলার ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, আরও আসছে। আমরা এখানে এই ধরনের বাংলা নাটক— "

"আপনার কি আধঘণ্টা সময় হবে ?"

মানুষটা থতমত খেয়ে বলল, "আধাঘন্টা ? কেন ?"

"পুরো ব্যাপারটা তা হলে ভালো করে সেটল করে ফেলতে পারতাম।"

"আমি ঠিক জানি না আপনি কীভাবে সেটল করতে চাইছেন।" মানুষটা রাগ- রাগ মুখে বলল, "কিন্তু আপনাকে আমি একেবারে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আমরা এই প্রজেক্টে একেবারে কোনরকম ঝামেলা সহ্য করব না। নো ওয়ে।"

ইশতিয়াক সাহেব হাসিহাসি মুখে বললেন, "ঠিক আছে। কিন্তু আমার আধঘন্টা সময় চাই।"

"ঠিক আছে।"

ইশতিয়াক সাহেব যেন খুব একটা বড় ঝামেলা মিটে গেছে সেরকম ভান করে ডাকলেন, "শমশের!"

শমশের নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বলল, "জি স্যার?"

"আমার সময় মাত্র আধঘণ্টা। তার মাঝে আমি পুরো ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলতে চাই।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"কতক্ষণ লাগবে তোমার ?"

শমশের হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "পুরোটাই কিনে ফেলবেন?"

"হ্যাঁ, ওয়াটার ওয়ার্ল্ড পুরোটাই কিনে ফেলব।"

"ফাইনালাইজ করতে সময় নেবে তবে ডিলটা পাকা করে আসতে পারি।"

"কতক্ষণ লাগবে ?"

"আপনার গাড়িটা আর আপনার সেলুলার ফোনটা যদি ব্যবহার করতে দেন তা হলে কুড়ি মিনিটে হয়ে যাবে স্যার।"

ইশতিয়াক সাহেব পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করে বললেন, "নাও।"

শমশের নিচু গলায় বলল, "একটা চেক সাইন করে দিতে হবে স্যার।"

"ও আচ্ছা, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ইশতিয়াক সাহেব চেকবই থেকে একটা চেক ছিড়ে সেটা সাইন করতে করতে বকুলকে ডাকলেন, "বকুলাপ্পু মা, এদিকে শোনো।"

বকুল এগিয়ে এল, "জি চাচা।"

"তোমার হাতের লেখা কেমন? নীলার হাতের লেখা একেবারে জঘন্য, পড়ার উপায় নেই।"

"আমারটাও বেশি ভাল না।"

"পড়া যায় তো? পড়া গেলেই হবে।"

"জি পড়া যায়।"

ইশতিয়াক সাহেব পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার একটা কাগজ ছিড়ে বকুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও লেখো।"

"কলম নাই চাচা।"

শমশের একটা কলম এগিয়ে দিল। বকুল কলমটা হাতে নিয়ে বলল, "কী লিখব?"

"লেখো ওয়াটার ওয়ার্ল্ড-এর জি. এম. জনাব আবু কায়সার এবং সহযোগী জনাব—" ইশতিয়াক সাহেব হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, "বিদেশী সাহেবটার যেন কী নাম?"

নীলা বলল, "পিটার ব্লাংক।"

"ও আচ্ছা, লেখো তা হলে ওয়াটার ওয়ার্ল্ড-এর জনাব আবু কায়সার এবং সহযোগী জনাব পিটার ব্লাংককে— "

বকুল লেখা শেষ করে বলল, "পিটার ব্লাংককে— "

"তাদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল। তার নিচে আমার নাম লিখে রাখো, শমশের খবর নিয়ে ফিরে এলেই সাইন করে দেব।"

আবু কায়সার নামের মানুষটার চোয়াল ঝুলে পড়ল এবং সে মাছের মতো খাবি খেতে লাগল। সে এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। বিদেশী সাহেবটা কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে বৃথাই একবার ইশতিয়াক সাহেবের দিকে আরেকবার আবু কায়সারের দিকে তাকাতে লাগল। ইশতিয়াক সাহেব এবারে তাদের পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বকুল কাগজটা ইশতিয়াক সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে চাচা লিখেছি।"

"থ্যাংকু মা।"

নীলা এগিয়ে এসে তার বাবার হাত ধরে বলল, "থ্যাংকু আব্বু।"

"ইউ আর ওয়েলকাম।"

"তুমি ওয়াটার ওয়ার্ল্ড কিনে ফেলবে জানলে আমরা একেবারে ভাংচুর করতে দিতাম না।"

"সেটা নিয়ে মাথা ঘামাসনে। নতুন ওয়াটার ওয়ার্ল্ড হবে চন্দ্রা নদীর তীরে পলাশপুর গ্রামে। সেখানে কোনো টুশকিকে বন্দী করা হবে না— তারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে। সেই খেলা দেখার জন্যে কোন পয়সাও দিতে হবে না কাউকে।"

"সত্যি বাবা?"

"সত্যি নয়তো কি মিথ্যা নাকি?" ইশতিয়াক সাহেব বকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি পারবে না চালাতে?"

"পারব চাচা।"

"গুড। ভালো একটা নাম দিতে হবে। বাংলা নাম— ওয়াটার ওয়ার্ল্ড একটা নাম হল নাকি? ছি!"

১০

শেষ খবর অনুযায়ী পলাশপুর গ্রামের চন্দ্রা নদীর তীরে শুশুক এবং নানা ধরনের জলজ প্রাণী সংরক্ষণের একটা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কয়েকজন জীববিজ্ঞানী এবং টেকনিশিয়ান মিলে সেখানে কাজ করে যাচ্ছে। শুশুকদের সাথে মানুষের ভাববিনিময় করার জন্যেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, বকুল খুব ব্যস্ত তাই নিয়ে।

এখনও ভালো একটা বাংলা নাম খোঁজা হচ্ছে কেন্দ্রটার জন্যে, যদি পাওয়া না যায় এটাকে "বকুলাপ্পু জলজ প্রাণী কেন্দ্র" নাম দিয়ে দেবেন বলে ইশতিয়াক সাহেব হুমকি দিয়েছেন।

বকুল প্রতি রাতে তাই বাংলা ডিকশনারি ঘাঁটাঘাঁটি করছে, খুব লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না।